গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

ডিজিটাল বুলেটিন - ৯ | www.ganadabi.com | ২২ জুন ২০২০

সীমান্ত সমস্যা মেটাতে অবিলম্বে আলোচনায় বসুক চীন ও ভারত

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৭ জুন এক বিবৃতিতে বলেন,

"এটা গভীর উদ্বেগ ও পরিতাপের বিষয় যে, যখন ভারত সহ সমগ্র বিশ্ব কোভিড ১৯-এর মারাত্মক আক্রমণের শিকার, যখন ভারত এবং চীন উভয় দেশই পূর্ব লাদাখে সীমান্ত সমস্যার সমাধানে পারস্পরিক আলোচনায় ব্যস্ত, ঠিক তখনই ১৫ জুন, ২০২০ আকস্মিক ভাবে এক ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কমপক্ষে ২০ জন ভারতীয় সেনা প্রাণ হারিয়েছেন।

আমরা ভারত ও চীন উভয় সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বা অন্য কোনও তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা ছাড়াই দুই দেশ বৈঠকে বসুক এবং যাতে শান্তিপূর্ণভাবে এই সীমান্ত সমস্যার ন্যায্য সমাধান করা যায় তার পথ বের করুক।"

ভোট আসতেই শ্রমিক-দরদির ভেক ধরলেন প্রধানমন্ত্রী

দিল্লি থেকে ভিডিও কনফারেন্স মারফত বিহারের একটি এলাকায় গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী হাসি হাসি মুখে পরিযায়ী শ্রমিকদের জিজ্ঞেস করেছেন, কেন ফিরতে হল? কী ভাবে ফিরলেন? শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রেখে বসার বন্দোবস্ত ছিল? শেষে প্রশ্ন করেছেন, কী? রাগ করেছেন আমার উপর?

এই প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর আজ দেশবাসীর জানা। অথচ জানা নেই কি কেবল প্রধানমন্ত্রীর? ভিন রাজ্য থেকে শ্রমিকদের কেন ফিরতে হল প্রধানমন্ত্রী জানেন না? সত্যিই কি এ তাঁর অজ্ঞতা? দেশের কোনও মানুষ তা মনে করেন না। বাস্তবে এ তাঁর ভান। কিন্তু কেন প্রধানমন্ত্রীকে আজ দরিদ্র, কাজ হারানো অসহায় শ্রমিকদের কাছে এমন দৃষ্টিকটু ভান করতে হচ্ছে? কারণ, সামনে বিহারের নির্বাচন। প্রধানমন্ত্রীর খুব ভাল করেই জানা আছে, করোনা মোকাবিলার নামে তাঁর অতর্কিত লকডাউন ঘোষণা দেশের কোটি কোটি অন্য সব সাধারণ মানুষের মতো কোটি কোটি পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবনেও কী নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট নামিয়ে এনেছিল। অন্যদের থেকে এই পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়তি কষ্ট ছিল সরকারি অসহযোগিতার কারণে প্রাণ হাতে নিয়ে তাঁদের বাড়ি ফেরার অভিযান।

দেশের বাইরে থাকা সমাজের উঁচুতলার মানুষদের জন্য যে সরকার

দুয়ের পাতায় দেখুন

জনজীবনের দাবি নিয়ে আন্দোলন হরিয়ানায়

মূল্যবৃদ্ধি রোধ, লকডাউনে বিপর্যস্ত সমস্ত গরিব মানুষকে মাসিক ১০ হাজার টাকা অনুদান, ছাত্রদের ফি মকুব প্রভৃতি দাবিতে হরিয়ানার রোহতকে এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে বিক্ষোভ। ১৯ জুন।

বিদ্যুৎ আইন (সংশোধনী) বিল-২০২০

জনগণের উপর আরও মাশুলের বোঝা চাপাবে

কলকাতায় সিইএসসি দপ্তরে বিক্ষোভ। ৩ জুন। (খবর সাতের পাতায়)

দেশ জুড়ে করোনা অতিমারির কারণে দীর্ঘদিন ধরে লকডাউন চলছে। কোনও সমাবেশ, গণবিক্ষোভ, গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলা এই অবস্থায় সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতির সুযোগে কেন্দ্রীয় সরকার চুপি চুপি চূড়ান্ত জনস্বার্থবিরোধী বিদ্যুৎ আইন (সংশোধনী) বিল, ২০২০ পাশ করিয়ে নিতে চাইছে। এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমারস অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা)। সংক্ষিপ্ত আকারে এই বিলের কিছু ভয়াবহ দিক দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরা হল।

১) লকডাউনের মধ্যে আচমকা বজ্রাঘাতের মতো গত ১৭ এপ্রিল কেন্দ্রীয় সরকার এই অত্যন্ত ভয়াবহ এবং চরম জনস্বার্থ বিরোধী বিদ্যুৎ আইন (সংশোধনী) বিল ২০২০-র প্রস্তাব অতি সন্তর্পণে হাজির করেছে।

স্বাধীনতার পর বিদ্যুৎ আইন-১৯৪৮ এ ঘোষণা করা হয়েছিল বিদ্যুৎ একটি পরিষেবা। এখানে কোনও মুনাফা নেওয়া হবে না। ২০০৩ সালে পূর্বের আইন সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়ে অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার নতুন বিদ্যুৎ আইন-২০০৩ চালুর মাধ্যমে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রকে বেসরকারি পুঁজিপতিদের মুনাফা অর্জনের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত করেছে। সমাজবিকাশের হাতিয়ার বিদ্যুৎকে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবার পরিবর্তে কর্পোরেট বৃহৎ পুঁজির মালিকদের মুনাফা অর্জনের পণ্য হিসাবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত জারি করেছে। সরকারি বিদ্যুৎ পর্ষদ ভেঙে উৎপাদন, পরিবহন, বন্টন এই তিনটি কোম্পানি গঠন করে কমপক্ষে ১৬ শতাংশ নিশ্চিত মুনাফার ব্যবস্থা এটিতে করা হয়েছিল। এর ফলে উত্তরোত্তর ভয়ঙ্কর মাশুল বৃদ্ধি সর্বসাধারণের ঘাড়ে চেপে বসায় আজও চরম যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন গ্রাহকরা।

২) বেসরকারি মালিকদের স্বার্থে বিদ্যুৎ আইনকে সংশোধন করার অপচেষ্টা চলে আসছে ২০১৪ সাল থেকে। ২০১৫ সালে অ্যাবেকার উদ্যোগে দিল্লি অভিযানের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে বিদ্যুৎ আইন-২০০৩ ও তার প্রস্তাবিত সংশোধনী বাতিল করার দাবি

দুয়ের পাতায় দেখুন

জনস্বার্থবিরোধী বিদ্যুৎ আইন

একের পাতার পর

জানানো হয়। কিন্তু তথাকথিত সংস্কারের নামে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের চেষ্টা চলতেই থাকে। এবার মোদি সরকার ২০২০-তে সংশোধনী হাজির করেছে। বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির সঙ্গে আবার 'ফ্র্যাঞ্চাইজি' নামে নতুন একটি বাড়তি মুনাফা লোটার সংস্থা হাজির করেছে। এতে সরকারি বন্টন কোম্পানিগুলির জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহে বেসরকারি কোম্পানির প্রধান ভূমিকা ও নিয়ন্ত্রণ চালু হবে। চতুর্থ দফায় আরও মাশুলের বোঝা চাপবে জনগণের ঘাড়ের উপর।

৩) ১৯৪৮ সালের আইনে তো বটেই, এমনকি ২০০৩-বিদ্যুৎ আইনের ৬২(৩) ধারায় বিভিন্ন ধরনের গ্রাহকদের জন্য বিভিন্ন হারে বিদ্যুৎ মাশুল (ডিফারেনসিয়েশন অফ ট্যারিফ) নির্ধারণের আইন আছে। একই ক্যাটেগরির গ্রাহকের কমবেশি ভোল্টেজের বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য, আলাদা ভৌগোলিক পরিবেশের জন্য, পাওয়ার ফ্যাক্টর ও বিদ্যুৎ ব্যবহারের উদ্দেশ্য বিচার করে আলাদা রেট (ট্যারিফ বেনিফিট) দেওয়ার ব্যবস্থা আইনে আছে। একটা সময়ে হঠাৎ করে 'ক্রস সাবসিডি' কথাটা ঢুকিয়ে দিয়ে কিছুদিন যাবৎ একটা বিভ্রান্তি প্রচার করার পর সেই তথাকথিত 'ক্রস সাবসিডি' বাতিল করার নামে এতকালের বিভিন্ন ধরনের বিদ্যুৎ মাশুল প্রথাকে শর্তাধীন করার মধ্য দিয়ে বাস্তবে সেটাকে তুলে দিয়ে অতি দরিদ্র থেকে শুরু করে বিশাল শিল্পপতিদের বিদ্যুৎ মাশুল একই হারে করার পরিকল্পনা এবার এই ২০২০-বিদ্যুৎ আইন সংশোধনীতে আনা হয়েছে। যা দেশে এক ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনবে। আয়ের উপায় এবং জীবনযাত্রা নির্বাহের আকাশ-পাতাল পার্থক্যের এই সমাজে বেঁচে থাকার জন্য একান্ত জরুরি হিসাবে বাজারে সকল জিনিসেরই দামের তারতম্য আছে। একই ট্রেনের বিভিন্ন কামরার টিকিটের দাম বিভিন্ন রকম আছে। বিদ্যুৎকে বিপুল মুনাফা অর্জনের প্রয়োজনে কিংবা কোনও প্রকারে বেঁচে থাকা কী কারণে ব্যবহার করা হচ্ছে সেই অনুযায়ী মাশুলের আলাদা আলাদা হার থাকা দরকার। কেবল তাই নয়, জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবে সরকারের বি পি এল কিংবা সাধারণ দরিদ্র মানুষকে অত্যন্ত কম দামে এবং দরিদ্র চাষি সহ কোনও কোনও স্তরে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়ার জন্য জনগণের ট্যাক্স থেকে সংগৃহীত সরকারি তহবিল থেকে ভর্তুকি দেওয়াও দরকার। এই দাবি জানিয়েছে অ্যাবেকা। কিন্তু এই সংশোধনীতে সরকার সমস্ত তথাকথিত 'পারস্পরিক ভর্তুকি' (ক্রস সাবসিডি) তুলে দিয়ে সকলের মাশুল সমান করা হবে বলে ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ পরিকাঠামো তৈরিতে মোট ব্যয়ের ৯০ শতাংশ যাদের জন্য বিদ্যুৎ পৌঁছতে খরচ হয়েছে, সেই বৃহৎ শিল্পপতিদের মাশুল কমবে, আর মাত্র ১০ শতাংশ পরিকাঠামো ব্যয়ে যে ক্ষুদ্র শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও কৃষিতে বিদ্যুৎ যায় তাদের মাশুল ব্যাপক বাড়বে। লেকিন এর মত বলা হয়েছে— যদি কোনও সরকার কোনও প্রকার গ্রাহকদের কিছু ভর্তুকিদিতে চায় তবে তা সরাসরি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দিতে হবে। অর্থাৎ আগে বিপুল হারে পাঠানো পুরো বিলটাই মেটাতে হবে। এ হল রান্নার গ্যাসের মতো আস্তে আস্তে সেই ভর্তুকি বাস্তবে উঠিয়ে দেওয়ার আইনি কৌশল।

৪) বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থা (ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল)/সি ই এস সি বা এই ধরনের অন্যান্য কোম্পানি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে নতুন করে ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়োগ করবে, যাদের লাইসেন্স দরকার হবে না। যার ফলে নতুন একটা স্তর বৃদ্ধির কারণে আর এক দফা বিদ্যুতের মাশুল বাড়বে শুধু তাই নয়, লাইসেন্সবিহীন ফ্র্যাঞ্চাইজির মাধ্যমে বন্টন জনিত সমস্যা (বিদ্যুৎ বিল, মিটার, লাইন মেরামত, ট্রান্সফরমার মেরামত ও প্রতিস্থাপন, নতুন লাইন নেওয়া, নিরাপত্তা ইত্যাদি) সমাধানে গ্রাহক হয়রানি ও অর্থ ব্যয় বিপুল ভাবে বৃদ্ধি পাবে।

৫) সংশোধিত বিদ্যুৎ আইনে নতুন করে ইলেকট্রিসিটি কন্ট্রাক্ট এনফোর্সমেন্ট অথরিটি (ইসিইএ) গঠন করা হবে যার উদ্দেশ্য ঝুঁকিহীন ব্যবসার পরিবেশ গড়ে দিয়ে বেসরকারি বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিক স্বার্থকে নিষ্কন্টক করা। এর ফলে আরও এক ধাপ বিদ্যুৎ মাশুল বাড়বে এবং এই সংশোধনী আইনে পরিণত হলে কেন্দ্রীয় সরকারের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণাধীন এই 'অথরিটি' বিদ্যুতের ক্রয়, বিক্রয় ও সঞ্চালন প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণের একচ্ছত্র অধিকারী হবে এবং রাজ্য সরকার ও রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ক্ষমতা এবং স্বাভাবিকভাবেই 'ওমবাডসম্যান' এর মধ্য দিয়ে নানা সমস্যা ও কোম্পানির নানা অন্যায়ের প্রতিকারে গ্রাহকদের যতটুকু সুযোগ ছিল সেটি পুরোপুরি খর্ব করা হবে। এই ইসিইএ অথরিটিকে হাইকোর্টের সমতুল্য অধিকার দেওয়ার ফলে ন্যায়বিচার না পাওয়া গ্রাহকদের যে কোনও সমস্যা নিয়ে একেবারে সুপ্রিম কোর্টে যেতে হবে। যা কোনও সাধারণ গ্রাহকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু কোনও বিশেষ স্বার্থে বৃহৎ পুঁজিপতিরাই সেই সুযোগ নেবে। ফলে এই আইন বলবৎ হলে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে নানা প্রকার জুলুমের প্রেক্ষিতে ন্যায়বিচার পাওয়ার গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বাস্তবে জনসাধারণ চিরতরে বঞ্চিত হবে।

৬) সংবিধানগত ভাবে বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ বিষয়। এই বিলে নানা বিষয়ে রাজ্যের প্রায় সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। যেমন, রাজ্যস্তরে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য মনোনয়নের প্রক্রিয়ায় রাজ্য সরকারের ক্ষমতা বিলুপ্ত করা হয়েছে, যা সংবিধান বিরোধী।

৭) এই সংশোধনীতে ক্রস-বর্ডার ট্রেডের নামে বিদ্যুতে বৈদেশিক বাণিজ্যের (আমদানি-রপ্তানি) ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দেশের মানুষকে অভুক্ত রেখে বিদেশে খাদ্য রপ্তানির মতোই, বিদ্যুৎ-ও বিদেশে যাবে যদি বিদ্যুৎ কোম্পানির সর্বোচ্চ লাভের লিপ্সা চরিতার্থ হয়, দেশের মানুষ বিদ্যুৎ পাক বা না পাক।

সমগ্র বিষয়টি মিলে এই সংশোধনীটি একটি দানবীয় আইন জারি করার প্রচেষ্টা। খোলাবাজার অর্থনীতি চালু করে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের মুনাফার স্বার্থে চালু করা জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইন-২০০৩ জনগণের দাবি মেনে প্রত্যাহার করা দূরের কথা, নতুন সংশোধনী-২০২০র মাধ্যমে সেই আইনকে আরও জনবিরোধী রূপ দেওয়া হচ্ছে। ফলে একে যে কোনও মূল্যে প্রতিরোধ করতে সবস্তরের জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে হবে।

ভেক ধরলেন প্রধানমন্ত্রী

একের পাতার পর

এমনকি বিনা খরচে বিমানের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, দেশের মধ্যে সমস্ত পরিবহণ বন্ধ করে দিয়ে সেই সরকারই ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। সেই দৃশ্য দেশবাসীর স্মৃতিতে এখনও খুবই টাটকা— হাজারে হাজারে লাখে লাখে শ্রমিক স্ত্রী-সন্তান নিয়ে দেশের রাজপথগুলি দিয়ে হেঁটে চলেছে। মা সন্তানকে কোলে নিয়ে হাঁটছেন তো, বাবা হাঁটছেন কাঁধে চাপিয়ে। কোথাও বৃদ্ধ অক্ষম বাবা-মাকে ডুলি তৈরি করে বয়ে নিয়ে চলেছেন সন্তানেরা। সরকার সেদিন শ্রমিকদের এই ভয়ঙ্কর উপায়হীন দুরবস্থার কথা মুহূর্তের জন্যও ভাবেনি। উপরন্তু কেন তাঁরা স্বাস্থ্যবিধি না মেনে শারীরিক দূরত্ব না রেখে রাস্তায় বেরিয়েছেন, তার কৈফিয়ত দাবি করে নামিয়ে এনেছিল নির্মম পুলিশি অত্যাচার। সেই নির্মমতার কথা ভাবলে আজও শ্রমিকরা ভয়ে শিউরে ওঠেন। পুলিশি অত্যাচার এড়াতে শ্রমিকরা কী ভাবে রাজপথ এড়িয়ে এমনকি দুর্গম বন-জঙ্গলের মধ্যে দিয়েও হাঁটতে বাধ্য হয়েছেন, ভিন রাজ্যের লঙ্কা খেতে কাজ করতে যাওয়া বারো বছরের বালিকা জামলো মকদমের মর্মান্তিক মৃত্যু তা সারা দেশের মানুষের সামনে নিয়ে এসেছিল। এ ভাবে হাঁটতে গিয়ে খাদ্যের অভাবে পানীয়ের অভাবে, দীর্ঘ পথ চলার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে শতাধিক শ্রমিক কী ভাবে ছটফট করতে করতে রাস্তায় পড়ে মারা গেছেন, সন্তানসম্ভবা মা পথেই সন্তানের জন্ম দিয়ে আবার হাঁটতে বাধ্য হয়েছেন, সংবাদমাধ্যমে তার অজস্র ছবি উঠে এসেছে।

এই সব মর্মান্তিক ঘটনার স্মৃতি শ্রমিকদের এবং দেশের মানুষের মনে যে অটুট রয়েছে তা প্রধানমন্ত্রী ভালোই জানেন। সামনে ভোট এসে যাওয়ায় তাঁদের এই স্মৃতিকেই আজ ভয় পাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। ভয় পাচ্ছেন রাজ্যে রাজ্যে শাসক দলের নেতারা। এই স্মৃতিকে ভোলাতেই প্রধানমন্ত্রীর এই না জানার ভান। শ্রমিকদের সীমাহীন কষ্ট আর নির্মম পুলিশি অত্যাচারের সামনেও যে প্রধানমন্ত্রী টুঁ-শব্দ করেননি, তাঁরা খাদ্যের জন্য, একটু আশ্রয়ের জন্য, প্রাপ্য মজুরিটুকুর বন্দোবস্ত করার জন্য বারবার কাতর আবেদন করলেও যে প্রধানমন্ত্রী তাতে এতটুকু পাত্তা দেননি, ভোটের আগে সেই তিনি আজ শ্রমিকদের সামনে ছুটে এসেছেন রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের ঝুলি নিয়ে। ঘোষণা করেছেন গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযান। শুধু তাই নয়, লকডাউনের মধ্যে শ্রমিকরা যখন খাদ্যের অভাবে, জীবিকার অভাবে বাঁচার জন্য এক অসম লড়াই লড়ছেন, তখন এই প্রধানমন্ত্রীই একের পর এক শ্রমিকদের অর্জিত অধিকারগুলি কেড়ে নিয়েছেন, তাঁদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন কালা আইনের বোঝা। আট ঘণ্টা শ্রমের অধিকার কেড়ে নিয়ে মালিকদের হাতে তুলে দিয়েছেন যথেচ্ছ খাটানোর দানবীয় অধিকার। সেই প্রধানমন্ত্রী আজ ভোটের আগে শ্রমিকদের বোঝাচ্ছেন তিনি শ্রমিকদের কত মর্যাদা দেন। বলেছেন, কেন্দ্র ও বিহার দুই সরকারই নাকি শুরু থেকেই পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য চিন্তিত ছিল। কতখানি নির্লজ্জ হলে প্রকাশ্যে এমন মিথ্যাচার করা যায়! পরিযায়ী শ্রমিকদের নজিরবিহীন দুরবস্থার জন্য যে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারই দায়ী তা দেশে আজ কারও জানতে বাকি নেই। একই ভাবে বিহারে ভোটের সামনে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী সেখানকার যে জোট-শরিক নীতীশ কুমারকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন, বিহারের সেই নীতীশ সরকারও এ রাজ্যে মমতা ব্যানার্জীর তৃণমূল সরকারের মতোই শুরু থেকেই পরিযায়ী শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনার বিরোধিতা করেছিল। দেশের মানুষের তা-ও কি অজানা? ভোটের আগে আজ সেই সব নেতারাই কোনও রকম চক্ষুলজ্জার বালাই না রেখে শ্রমিকদের মন ভেজাতে শ্রমিক-দরদির ছদ্মবেশে তাঁদের সামনে হাজির হয়েছেন।

বাস্তবে এই হল ভোটবাজ দলগুলির, তাদের নেতাদের স্বরূপ। মানুষের প্রতি কোনও দরদই এঁদের নেই। তাঁদের দুদর্শা এঁদের হৃদয়কে এতটুকুও আলোড়িত করে না। আসলে মানুষকে এঁরা মানুষ মনে করেন না। মানুষ শুধু এঁদের কাছে একেক জন ভোটার মাত্র। তাঁরা মনে করেন পুঁজিবাদী শোষণে, শাসকদের নিষ্পেষনে তাঁদের জীবন যতই জর্জরিত হোক, ভোটের আগে কিছু খুদ-কুঁড়ো ছুঁড়ে দিলেই সেই ক্ষতে মলম দেওয়া হয়ে যায়। মানুষকে ভুলিয়ে দেওয়া যায় অতীতের সব দুঃস্বপ্নের স্মৃতি। মানুষকে এঁরা নির্বোধ ভাবেন। বাস্তবে মানুষ নির্বোধ তো ননই, বরং শাসকদের চেয়ে সমস্ত দিক থেকেই বেশি সংবেদনশীল। তাঁরা শাসক বুর্জোয়া নেতাদের প্রতারণা স্পষ্টই ধরতে পারেন। কিন্তু সংগঠিত না হওয়ার জন্য এই প্রতারণার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার রাস্তাটা তাঁরা দেখতে পান না। বারে বারেই তাঁরা শাসক দলগুলির দ্বারা প্রতারিত হন। কিন্তু আর পড়ে পড়ে মার খাওয়া নয়। শ্রমিকদেরই এগিয়ে এসে আজ সঠিক নেতৃত্বে সচেতন সংঘশক্তি গড়ে তুলতে হবে এবং এর দ্বারাই একমাত্র শ্রমিক শ্রেণি তথা দেশের সাধারণ মানুষ শাসকদের চাপিয়ে দেওয়া এই স্থায়ী দুঃশাসনের হাত থেকে রেহাই পেতে পারেন।

সারা দেশে গণতন্ত্র হত্যার ছবি মিলে যাচ্ছে কাশ্মীরের অভিজ্ঞতার সঙ্গে

প্রধানমন্ত্রী ২৪ মার্চ সারা দেশে লকডাউন জারি করলে কী হবে, বস্তুত াশ্মীর তো সেই গত বছরের আগস্ট মাস থেকেই ঘরবন্দি। তাদের জীবন 'আনলক' করার কোনও উদ্যোগ তো এতগুলি মাসেও সরকার নিল না। এই করোনা মহামারির আবহে একবার দেখা যাক কেমন আছে কাশ্মীর? তাদের জীবনের মূল্য কতটুকুই বা দিল কেন্দ্রীয় সরকার। বিশেষত রাজ্যের মর্যাদা হারানো কাশ্মীর তো এখন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনেই।

লকডাউন ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, প্রাণরক্ষা করাটাই এখন প্রধান কাজ। প্রাণে বাঁচলে আবার সব হবে। সারা দেশে তাঁরা কেমন প্রাণ বাঁচিয়েছেন তার জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে আছেন বেঘোরে প্রাণ হারানো শত শত পরিযায়ী শ্রমিক। আর তারই সাথে অবর্ণনীয় দুর্দশাগ্রস্ত শহর ও গ্রামের প্রায় ৮০ কোটি দরিদ্র মানুষ। কিন্তু আপাতত সে সব ছেড়ে এখন দেখা যাক শুধু কাশ্মীরকে।

এ ক্ষেত্রে অবশ্য বিজেপি নেতারা বলতেই পারেন, অন্তত এই একটা পথে সারা দেশের সাথে কাশ্মীরকে এক করে দিতে পেরেছেন নরেন্দ্র মোদি। কাশ্মীরের মানুষের জীবনরক্ষার জন্য কী করেছে সরকার? সংবাদমাধ্যম জানাচ্ছে, 'উপত্যকায় ৬৮ লক্ষ মানুষের জন্য বরাদ্দ মাত্র ২০০টি ভেন্টিলেটর, অথচ দশ জন নাগরিক পিছু মোতায়েন একজন সশস্ত্র আধা সেনা। 'নতুন কোনও হাসপাতাল তৈরি, করোনা মোকাবিলার পরিকাঠামো গড়ে তোলা—এসব কাজে 'সময় নষ্ট' করেনি সরকার। দেশের কোথাও সাধারণ মানুষের জীবন রক্ষা সরকারের ধ্যান-জ্ঞান ছিল কি? সারা দেশেই সরকার লকডাউনের মধ্যে জীবন রক্ষার চেয়ে জোর দিয়েছে কীসে?

আকস্মিক লকডাউনে জনজীবনকে অচল করে দেওয়ায় সাধারণ মানুষ যখন চরম দুর্দশার মধ্যে পড়েছে, সেই সময় দেখা গেল, এ ব্যাপারে উদাসীন এই সরকার কিন্তু কিছু ব্যাপারে অত্যন্ত সক্রিয়। ২৪ মার্চ ভোররাতে দিল্লির শাহিনবাগের প্রতিবাদী মঞ্চকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। করোনা সংক্রমণের অজুহাতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এনআরসি সিএএ এবং এনপিআর বিরোধী প্রতিবাদী ধর্নামঞ্চগুলি তুলে নিতে বাধ্য করা হয়েছে। খুঁজে খুঁজে রাষ্ট্র বিরোধী কালাকানুনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে শাহিনবাগ আন্দোলনের সংগঠকদের। জামিয়া মিলিয়া, জেএনইউ, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবাদী মুখগুলিকে এবং ভীমাকোরেগাঁও মামলায় জড়িয়ে বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদদের। বহু লড়াইয়ের ফলে অর্জিত দেশের শ্রম আইন পাল্টে ফেলার কাজটা অতিমারি রোখার থেকেও সরকারের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। একই রকম ভাবে টেস্ট কিট, ওষুধ, পিপিই, ভেন্টিলেটরের সরবরাহ বাড়ানোর কাজের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন বাতিলের কাজটি। ঠিক এই সময়টাকেই সরকার বেছে নিয়েছে কৃষি ফসলের ব্যবসাকে পুরোপুরি কর্পোরেট পুঁজির হাতে তুলে দেওয়ার নীতি চালু করার আদর্শ সুযোগ হিসাবে। জনবিরোধী জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১৯ কে কার্যকরী করার মওকা কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক এই সময়েই পেয়েছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কাছে এসব ক্ষেত্রে লকডাউন বাধা হয়নি বরং সুবিধা হয়ে গেছে।

কাশ্মীর উপত্যকায়ও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। এমনিতেই গত বছর আগস্ট মাস থেকে গোটা কাশ্মীর উপত্যকা তালাবন্ধহয়েই আছে।। মোবাইল, ইন্টারনেট দীর্ঘকাল ধরে বন্ধ থেকেছে। ফলে কাশ্মীর সারা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। সংবাদ মাধ্যম সহ উপত্যকার মানুষের সমস্ত ধরনের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তাই করোনার আবহে আরেকটি লকডাউন কাশ্মীর উপত্যকার মানুষের কাছে নতুন বিপদের বার্তা নিয়ে এসেছে। যখন প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী লকডাউনের মধ্যে সারা দেশ যখন করোনা যুদ্ধে ব্যস্ত, সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকার কাশ্মীরে ওষুধ-অক্সিজেন ভেন্টিলেটর-পিপিই নিয়ে মাথা ঘামায়নি। তারা তড়িঘড়ি জারি করেছে জম্মু-কাশ্মীরের 'নতুন স্থায়ী অধিবাসী আইন'। যে আইনকে আবার ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই সংশোধন করতে হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বছর ৫ আগস্ট ৩৭০ ধারা বিলোপ করে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যকে ভেঙে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করেছে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার। একই সাথে ৩৫এ ধারা বাতিল করে দিয়েছে। তখন থেকেই 'স্থানীয় অধিবাসী আইন' পরিবর্তনের আশঙ্কা কাশ্মীর উপত্যকার প্রতিটি মানুষের মধ্যেই কাজ করছিল। এই 'সংশোধিত অধিবাসী আইনের' ফলে এক ধাক্কায় পূর্বতন জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের 'অধিবাসীর' যে সংজ্ঞা পাল্টে দেওয়া হল— এখন থেকে যারা টানা ১৫ বছর ওই অঞ্চলে বসবাস করছেন অথবা যারা ওই রাজ্যে সাত বছর পড়াশোনা করে দশম/ দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা দিয়েছেন তাঁরাও সে রাজ্যের স্থায়ী অধিবাসী হিসেবে গণ্য হবেন। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা যারা ১০ বছর ওই রাজ্যে চাকরি করছেন তাদের সন্তানরাও স্থায়ী অধিবাসী হিসেবে চিহ্নিত হবেন। সংবিধানের ৩৭০ ধারা অনুযায়ী জম্মু-কাশ্মীরের অধিবাসীরাই সে রাজ্যে সরকারি চাকরি, বৃত্তি ও জমিজমা কেনার অধিকারী ছিলেন। নতুন সংশোধিত আইনের ফলে সেটা আর রইল না। স্বাধীনতার পর থেকে দিল্লির গদিতে যে সরকারই বসেছে, তারাই ৩৭০ ধারাকে দুর্বল করেছে। তবু এর জোরে যে সীমিত স্বায়ত্ত শাসন ও জনসংখ্যার বিন্যাস ছিল, বর্তমান সংশোধিত আইনের ফলে তা আর থাকছে না। বর্তমানে জম্মু-কাশ্মীর কেন্দ্র শাসিত রাজ্য হবার ফলে, অতি দ্রুততার সাথে কেন্দ্রীয় সরকার পরিবর্তিত আইনের প্রয়োগও শুরু করে দিয়েছে। কোভিড-১৯ ভাইরাসের সাথেই এই নতুন অধিবাসী আইন কাশ্মীরিদের ইতিমধ্যেই আহত মানসিকতার ওপর নতুন করে আঘাত হেনেছে। সরকার বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কাশ্মীরের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দ্রুত ফিরিয়ে দিয়ে সেখানে নতুন করে বিধানসভা নির্বাচন করা হবে। অথচ কাশ্মীরবাসীদের মতামত নেওয়ার জন্য এই সময়টুকু অপেক্ষা করার তর সয়নি মোদি সরকারের।

স্থানীয় কাশ্মীরিদের প্রতিক্রিয়া

কেন্দ্রীয় সরকারের এই আইন পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত জম্মু-কাশ্মীরের বিভিন্ন মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। স্থানীয় কাশ্মীরিদের কাছে এই আইন তাদের জন্মভূমি থেকে উচ্ছেদের চেষ্টার হাতিয়ার হিসাবেই পরিগণিত হচ্ছে। তাঁরা দেখছেন একইসাথে এর দ্বারা দ্রুত সে জনবিন্যাসের চিত্রটির পরিবর্তন ঘটবে।

প্রাক্তন এয়ার ভাইস মার্শাল কপিল কাক, যিনি সুপ্রিম কোর্টে ৩৭০ ধারা বাতিলের বিরুদ্ধে আবেদন করেছেন, তিনি আলজাজিরা টিভিকে জানিয়েছেন, 'এত চুপিসারে বহিরাগতদের স্থায়ী বাসিন্দা করে দেওয়ার চেষ্টা কাশ্মীরিদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।'

আইনের অধ্যাপক শেখ সওকাত হোসেনের মতে, 'এটা তো হতেই যাচ্ছিল। ৩৭০ ধারা বাতিলের আসল উদ্দেশ্য তো কাশ্মীরের জনবিন্যাসের ছবিটা পাল্টে দেওয়া'। মানবাধিকার কর্মী খুরাম পারভেজ এর মতে, 'এই আইনের দ্বারা বহিরাগতরা দাবিদার হয়ে জম্মু-কাশ্মীরের বেকার সমস্যা বাড়িয়ে দেবে। এটা রাজ্যের কর্মহীন যুবকদের স্বার্থের পরিপন্থী।'

জম্মু-কাশ্মীরের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল কনফারেন্স ও পিডিপি তো বটেই কাশ্মীরের মানুষের সেন্টিমেন্টকে ধোঁকা দিতে কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্বের লাইনের বাইরে গিয়ে জম্মুর স্থানীয় বিজেপি নেতারা পর্যন্ত 'স্থায়ী অধিবাসী প্রশ্নে' আশঙ্কা ব্যক্ত করে অমিত শাহকে চিঠি দিয়েছেন।

গরিব কাশ্মীরিদের ওপর আসছে ভয়াবহ আক্রমণ

গত ৮ এপ্রিল কেন্দ্রশাসিত জম্মু-কাশ্মীরে একটি নতুন আদেশ বলে কাশ্মীরের দুই ঐতিহাসিক 'ডাল' ও 'নিগিন' লেকে নতুন হাউসবোট ও শিকারার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। অতঃপর যা সব নিয়ম ও নথিভুক্তির জটিল প্রক্রিয়া বলা হয়েছে, তাতে আগামী দিনে এই অনুমোদনের জন্য বেশ কাঠখড় পোড়াতে হবে। কারণ, নাকি দূষণ নিয়ন্ত্রণ! আপাত নিরীহ পরিবেশ বান্ধব এই আদেশনামার আড়ালে গরিব কাশ্মীরিরা তাদের ভাতে মারার অভিসন্ধি খুঁজে পাচ্ছেন। এর ফলে আগামী দিনে কাশ্মীরিরা ওই লেক দুটিতে হাউসবোট বা শিকারা চালাতে পারবেন না বলে আশঙ্কা। কারণ গোয়া বা কেরালায় যেমন নদী বা 'ব্যাকওয়াটারে' বিলাসবহুল হাউসবোট চলে, কাশ্মীরেও সরকার সেই ব্যবস্থা করতে চলেছে, যা এতদিন হাউসবোট চালিয়ে আসা সাধারণ কাশ্মীরিদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। ফলে এই ব্যবসা বৃহৎ পর্যটন সংস্থা এবং করপোরেট হাউসের হাতে চলে যাবে বলে স্থানীয়দের বিশ্বাস। যা স্থানীয় বহু গরিব মানুষের জীবিকা কেড়ে নেবে।

নতুন অধিবাসী আইন চালু করার সময় রাজ্য প্রশাসনের করোনা ভাইরাসের বিষয়টা মাথায় না থাকলেও উপত্যকায় ১০টি জেলায় কোটির অধিক বিশাল বিশাল 'রাশিয়ান পপলার' গাছ যা গত শতব্দীতে ৮১-৮২ সালে বিশ্ব ব্যাঙ্কের টাকায় সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পে লাগানো হয়েছিল, যা বর্তমানে মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ, তাকে রাজ্যের ডেপুটি কমিশনার এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে অতি দ্রুততার সাথে কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। এই গাছ সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকার সাথে যুক্ত। সম্প্রতি সরকারি আদেশনামায় বলা হয় এপ্রিলের প্রথমে এই গাছের যে পরাগ রেণু হয় তা কোভিড ১৯ সংক্রমণে সাহায্য করে। স্বাভাবিকভাবে পরিবেশবিদদের প্রশ্ন এত বছর তো এ প্রশ্ন ওঠেনি? সারা বিশ্বে বহু দেশে পাহাড়ি এলাকায় এই গাছ আছে। কবে কোথায় কোন বিজ্ঞানী এই তত্ত্ব দিলেন? কোনও নিশ্চিত প্রমাণ ছাড়াই এত অবিশ্বাস্য দ্রুততার কোনও সরকার লক্ষ লক্ষ গাছ কেটে ফেলতে পারে? তারা পরিবেশের ভারসাম্য নিয়ে এতটুকুও চিন্তিত হলে এটা সম্ভব হত? সরকারি আদেশে এও বলা হয় ওই গাছ নাকি ভূস্বর্গের জলস্তর নিম্নগামী করছে। ফলে ভবিষ্যতে কাশ্মীরে জলসংকট দেখা দেবে। প্রশ্ন উঠছে লকডাউনের মধ্যে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? করোনা মহামারি রোধে তৎপরতা নাকি কোটির অধিক 'রাশিয়ান পপলার' গাছকে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় কেটে ফেলা? এর ফলে যে দশটি জেলা জুড়ে কয়েক লক্ষ একর সরকারি খালি জমি তৈরি হবে সেটাই আসল লক্ষ্য নয় কি? কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ আশঙ্কা করছেন এই জমিগুলি জমি-মাফিয়া ও কর্পোরেট হাউসের দখলে চলে যাবে। এর ফলে আরও কয়েক লক্ষ মানুষ তাদের জীবিকা হারাবেন।

সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধ গণতন্ত্রের কফিনে ঠোকা একটি পেরেক

২০ এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ মসরৎজারা নামে এক মহিলা সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ইউএপিএ ধারায় এফআইআর করেছে। অভিযোগ জারা ১৯ মাস আগে সেপ্টেম্বর ২০১৮-তে তার ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি প্রকাশ করে। ২৬ বছরের তরুণী জারা ঝুঁকি নিয়ে সংবাদ তৈরি করার মতো সাহসী সাংবাদিক হিসেবে পরিচিত। তিনি ওয়াশিংটন পোস্ট, আল-জাজিরা সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের হয়ে সাংবাদিকতা করেছেন। ওই ইনস্টাগ্রামের ছবিতে দেখা যাচ্ছে হিজবুল মুজাহিদিনের নিহত কমান্ডার বুরহান ওহানির ছবি সহ পোস্টার নিয়ে শিয়াপন্থী মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষরা মিছিল করছে। যে পোস্টারে 'শহিদ বুরহান ওহানি' কথাগুলো লেখা আছে। উল্লেখ্য ছবিটি বর্তমানে আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থা 'গেইটি ইমেজের' সম্পত্তি। একজন সাংবাদিক

চারের পাতায় দেখুন

মিলে যাচ্ছে কাশ্মীরের অভিজ্ঞতার সঙ্গে

তিনের পাতার পর

হিসাবে জারা নিরপেক্ষভাবে বাস্তব একটি ঘটনাকে তুলে ধরেছিলেন মাত্র। তিনি নিজে বুরহানকে শহিদ আখ্যা দেননি, বা তার সংগঠনের কাজকে সমর্থনও করেননি। সাংবাদিক হিসাবে 'গ্রাউন্ড রিয়েলিটি'-কে তুলে ধরাই তাঁর কাজ। তিনি সেই দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯ মাস বাদে সম্প্রতি জম্মু-কাশ্মীরের পুলিশ তাকে সাবধান করে জানায় ওই ছবি পোস্ট করার জন্য তার বিরুদ্ধে ইউএপিএ ধারায় কানুনি প্রক্রিয়া চলছে। ওই এফআইআর-এ পুলিশ তাকে চিত্র সাংবাদিকের পরিবর্তে একজন ফেসবুক ব্যবহারকারী বলে উল্লেখ করেছে।

শুধুমাত্র রিপোর্টে তথ্যের ভুলের জন্য রিপোর্টার পীরজাদা আশিককে জঙ্গি কার্যকলাপ বিরোধী আইনে থানায় আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছে। গত ১৭ এপ্রিল শোপিয়ান জেলার দায়রুকিগাম অঞ্চলে পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, দুজন সন্ত্রাসবাদী পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারায়। কিন্তু অজানিত কারণে তাদের দেহ আত্মীয়দের হাতে না দিয়ে ১৯০ কিলোমিটার দূরে বারমুলা জেলার একটি টিলায় তাদের কবর দেয় সরকারি সুরক্ষা বাহিনী। সাংবাদিক আশিকের অপরাধ হল নিহত ওই দুই যুবকের পরিবার থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তিনি সংবাদে লিখেছিলেন, ওই পরিবারের আবেদন মেনে কর্তৃপক্ষ দেহ শনাক্ত করে কবর দেওয়ার অনুমতি প্রদান করেছিল। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য তারা কবরের অনুমতি দেয়নি, দিয়েছিল কারফিউ পাস। শুধুমাত্র এই অজুহাতে 'ফেক নিউজ' তৈরির এই অভিযোগে তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

গোহর গিলানি হলেন তৃতীয় সাংবাদিক যিনি গত ২১ এপ্রিল এই দানবীয় আইনের শিকার। বিজেপির গুড বুকে থাকা সাংবাদিক অর্ণব গোস্বামী যখন সরকারের পেটোয়া কিছু অজানা কাশ্মীরি রাজনৈতিক ব্যক্তিকে আগামী দিনের রাজ্যের ভবিষ্যৎ হিসেবে তুলে ধরেছিলেন, রিপাবলিক টিভিতে ওই প্রোগ্রামের সাথে যুক্ত করে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে কোনও প্রবাসী কাশ্মীরি, গিলানির একটি তির্যক মন্তব্য টুইট করে দেন। একেই রাষ্ট্র ও দেশের প্রতি বিদ্বেষ ও বিপদজনক বলে চিহ্নিত করে জম্মু-কাশ্মীরের পুলিশের আইজি ২৪ এপ্রিল বিবৃতি দেন। এভাবেই লকডাউনে করোনার আবহে একের পর এক প্রতিবাদী ও নির্ভীক সাংবাদিকদের কণ্ঠ রোধ করা হচ্ছে।

এই ঘটনার ঠিক ৮ দিন আগে ১৬ এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ প্রকাশ্য বিবৃতিতে জানায়, 'কাশ্মীরের সাইবার পুলিশ নেট ব্যবহারকারীদের সমস্ত প্রোফাইল খেয়ালে রাখছে এবং যে সমস্ত বিষয়বস্তু আপলোড করা হচ্ছে তা নজরে রাখছে।' এমনকি অজানা প্রোফাইল থেকে যদি রাষ্ট্রবিরোধী কিছু আসে, তাকেও খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়া হবে। কাশ্মীরের নবগঠিত সাইবার পুলিশ স্টেশন, 'সমস্ত কাশ্মীরিদের ইউএপিএ আইনকে ভালো করে লক্ষ করতে বলছে।' যেখানে রাষ্ট্রের প্রতি কোনও রকম অশ্রদ্ধাকে (পড়ুন সমালোচনা) আইনবিরোধী আখ্যা দেওয়া যাবে। দেশের কোনও অংশে স্বায়ত্তশাসনের দাবিও ওই আইনের আওতায় পড়ে যাবে। বিচ্ছিন্নতাবাদী কিংবা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ছেন যে সব সাধারণ মানুষ, তাঁদের ক্ষোভকে সহানুভূতির সাথে নিরসনের দাবিও সংশোধিত ইউএপিএ আইনে শাস্তিযোগ্য। ফলে এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও সংবাদ যদি সরকারের পক্ষে অস্বস্তিকর হয়, তা উক্ত আইনের আওতায় চলে আসবে।

প্রায় বছর ঘুরতে চলল কাশ্মীরে 'ইলেকট্রনিক কারফিউ' চলছে। দীর্ঘদিন তো কোনও ইন্টারনেট বা মোবাইল যোগাযোগ ছিল না। বর্তমানে তার সীমিত অর্থে (২জি) চালু হলেও সোশ্যাল মিডিয়াকে কড়া নজরে রাখা হয়েছে। যাতে কোনও কারণে সরকার বিরোধী কণ্ঠস্বর শোনা না যায়। এব্যাপারে দেশের বিচার ব্যবস্থা অদ্ভুত ধরনের নীরবতা, কোনও কোনও ক্ষেত্রে অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেছে। ফলে কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতা বর্তমান রাষ্ট্র আইনের মান্যতা পেয়ে যাচ্ছে।

গত আগস্টে ৩৭০ ধারা বিলোপ এর সাথে সাথে কাশ্মীরের সংবাদমাধ্যমের যতটুকু আপেক্ষিক স্বাধীনতা অবশিষ্ট ছিল তা লোপ পেয়েছে। এক অদ্ভুত ভয় সংবাদমাধ্যমকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে, প্রশাসন সমস্ত সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেবে। সংবাদমাধ্যমকে কালাকানুনের নানা বেড়াজালে

উপত্যকার ২৮ বছরের বডি বিল্ডার মারুফ আহমেদ ভাট, ৪০০ ছররা গুলি শরীরে বহন করছে। প্রায় অন্ধ এই যুবক বহুবার নিজের হাতের শিরা কেটে আত্মহত্যা করে পরিবারকে আর্থিক বোঝা থেকে নিষ্কৃতি দিতে চেয়েছে, তার কাছে করোনা অতিমারি তো তুচ্ছ ব্যাপার বলে মনে হয়।

জড়িয়ে ফেলবে। ফলে অধিকাংশ সংবাদমাধ্যম স্বেচ্ছা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। নিবন্ধকারদের বলা হচ্ছে, 'হয় সুর নরম করুন, না হয় লেখা বন্ধ করুন।' বিষয়টা এখন এমন দাঁড়িয়েছে কোনও সন্ত্রাসবাদী (জিহাদি) নিহত হলে শুধুমাত্র সরকারি ভাষ্য ছাপা হচ্ছে। আগে ওই নিহত ব্যক্তির পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে কেন সে সন্ত্রাসবাদী (জিহাদি) হয়ে গেল সে সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য সম্বলিত খবর প্রকাশ করা সম্ভব ছিল। যার ফলে সারা দেশের মানুষ জানতে পারত সরকারের ভ্রান্ত নীতি কীভাবে শান্তিপ্রিয় কাশ্মীরিদের সন্ত্রাসবাদের ধ্বংসাত্মক পথে ঠেলে দিচ্ছে। এর ফলে সরকারের অস্বস্তি বাড়ত, কিন্তু সকল কাশ্মীরি মানুষকে সন্ত্রাসবাদী বলে দাগিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত সফল করতে কিছুটা অসুবিধা হত সীমান্তের দুই পারেরই কায়েমী স্বার্থবাদীদের। এখন কেন করা হচ্ছে না? এই প্রশ্নের জবাবে উপত্যকায় সর্বাধিক প্রচারিত ইংরেজি দৈনিক 'গ্রেটার কাশ্মীরে'র এক সাংবাদিককে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বলেন, 'এটাই এখন দস্তুর' অর্থাৎ স্বাভাবিক ঘটনা। গত বছর প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী সোহেল নকশবন্দী 'গ্রেটার কাশ্মীর' থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি বুঝতে পারছিলেন তাঁর আঁকা কার্টুন 'সেন্সর' করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় তথ্য-সম্প্রচার মন্ত্রক জম্মু-কাশ্মীর প্রশাসনকে জানিয়েছে কোনও রকম 'প্রতিবাদী শিল্পকে' যেন সহ্য করা না হয়। প্রশাসনের এই ভয়ঙ্কর চাপের মুখে কাশ্মীরের সংবাদ মাধ্যম এক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন। আগামী দিনে সেটা আরও কঠিনতর হতে চলেছে বলে আশঙ্কা। শুধু সাংবাদিক নন বহু সাধারণ মানুষকে দেশবিরোধী (!) আখ্যা দিয়ে ইউএপিএ-এর মত কালাকানুনের আওতায় জড়িয়ে দেওয়া হতে পারে বলে সাংবাদিকদের আশঙ্কা। সাম্প্রতিককালে কাশ্মীর উপত্যকার বিভিন্ন সাংবাদিককে যেভাবে ইউএপিএ সহ অন্যান্য কালাকানুন আটক করা হচ্ছে তাতে একটা বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার ৩৭০ ধারা বিলোপ করে বিশেষ স্ট্যাটাস কেড়ে নেওয়ার পর— তার প্রতিবাদ করা বা পুরনো অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাকে রাষ্ট্রদ্রোহ হিসেবে দেখা হবে। কাশ্মীরের প্রশাসন চাপ ও ধমকি দিয়ে সংবাদমাধ্যমকে সেটাই বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে।

কাশ্মীরের সাংবাদিকদের স্বাধীনতা হরণ কেন্দ্রীয় সরকার যতই চেপে রাখার চেষ্টা করুক না কেন, তা সম্পূর্ণ সফল হয়নি। মশরৎ জারা'র ঘটনায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাষাবিদ ও মানবাধিকার কর্মী 'নোয়াম চমস্কি' সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এ ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। নিউইয়র্ক ও প্যারিসের সাংবাদিকদের অধিকার রক্ষা সংস্থা সিপিজে (কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস) ও আর ডব্লিউ বি (রিপোর্টার উইদাউট বর্ডার) এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'ফ্রিডম হাউস' জানিয়েছে কাশ্মীরে মানবাধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ বিশ্বের ২৫টি বড় গণতান্ত্রিক দেশের মধ্যে সবচেয়ে নিম্নগামী (সূচক স্তর ৭১)। প্রেসের স্বাধীনতার প্রশ্নে ভারতের অবস্থান ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৪২তম।

আজ যখন সারা দেশ অতিমারি করোনার আবহে লকডাউনের মধ্যে প্রায় ঘরবন্দি অবস্থায় আছে, কেন্দ্রীয় সরকার তখন করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলতে বলতে সাধারণ ও শ্রমজীবী মানুষের বিরুদ্ধে যাবতীয় কালাকানুনের অস্ত্র শানাচ্ছে। নিবন্ধের শুরুতেই তা বলা হয়েছে। আর করোনার আবহে কাশ্মীরের মানুষকে 'ডাবল লকডাউন' এর মার সহ্য করতে হচ্ছে। যদিও তাদের সেই কান্না এখন দেশবাসীর কাছে পৌঁছাচ্ছে না।

কাশ্মীরে লকডাউন মানে নকডাউন

লকডাউনের কাশ্মীরে একটা পরিচিত দৃশ্য, ভোরে মসজিদের মাইকে ঘোষণা, 'সবাইকে খেলার মাঠে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হবে।' কোন হতভাগ্যদের বেছে বেছে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে, সেনাদের গাড়িতে পিছনের সারিতে বসে থাকা বিড়াল ('চর') দের নির্দেশে কোন অজ্ঞাত স্থানে, তা কেউ জানে না। 'ডাউন' শব্দটি এখানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। কখনও কিছু বিধিনিষেধ সহ কারফিউ', কখনও 'ক্যাসো'(কর্ডন করে সার্চ করা) সহ 'ক্র্যাকডাউন'।

এই লকডাউনের আবহে ভীত কাশ্মীরিরা দেখছে কাকে যে করোনা আক্রান্ত সন্দেহে তুলে নিয়ে গিয়ে জন্তুসম বন্দিশালায় রেখে দেওয়া হবে, তা ঠিক করতে ডাক্তারদের চেয়েও ক্ষমতা বেশি 'সুরক্ষা বাহিনীর'। এই আতঙ্কে স্বেচ্ছা আরোপিত হরতাল পালন করছে নিপীড়নের প্রতিবাদে। তাই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসাটা কাশ্মীরিদের এখন কল্পনাবিলাস বলে মনে হয়। গ্রাম-শহরে অসংখ্য মানুষ গৃহহীন ও বেকার, তাদের কাছে বর্তমান সময়ে 'স্টে হোম', 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' এইসব সরকারি নির্দেশের সাজানো কথাগুলি অর্থহীন বলে মনে হয়।

উপত্যকার ২৮ বছরের বডি বিল্ডার মারুফ আহমেদ ভাট, ৪০০ ছররা গুলি শরীরে বহন করছে। প্রায় অন্ধ এই যুবক বহুবার নিজের হাতের শিরা কেটে আত্মহত্যা করে পরিবারকে আর্থিক বোঝা থেকে নিষ্কৃতি দিতে চেয়েছে, তার কাছে করোনা অতিমারি তো তুচ্ছ ব্যাপার বলে মনে হয়।

আরেক জন তরতাজা যুবক যাকে 'মিস্টার বডগাম' বলা হত, সে ছিল একজন সফল কল সারাই এর মিস্ত্রি, যে কাজ করে যথেষ্ট রোজগার করত। ২০১৬ সালে বকরি ঈদের দিন ভেড়ার মাংস বিতরণ করতে গিয়েছিল। ফেরার পথে পুলিশের ছররা গুলির আঘাতে তার দৃষ্টি ও জীবনীশক্তি প্রায় নির্বাপিত। শরীরে মোট ৬৫০টি ছররা গুলি নিয়ে কোনও রকমে সে বেঁচে আছে। তার দীর্ঘশ্বাস, 'আমার আঘাত করোনা ভাইরাসের থেকেও মারাত্মক, আর আমার সামাজিক দূরত্ব; সে তো পৃথিবীতে যে কোনও মানুষের চেয়ে ঢের বেশি'।

গত আগস্ট মাস থেকে এখন পর্যন্ত কাশ্মীরের দৃশ্যপটকে যদি একের পর এক সাজিয়ে দেখি তাহলে দেখতে পাব, উপর্যুপরি লকডাউনের ফলে উপত্যকার স্বাভাবিক সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চূড়ান্ত সঙ্কটে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার একের পর এক নতুন আইন এবং নির্দেশনামার মাধ্যমে উপত্যকার অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতিকে পঙ্গু করে দেবার ষড়যন্ত্র করছে বলে সর্বস্তরের কাশ্মীরের মানুষের আশঙ্কা। আজ সারা দেশের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের অভিজ্ঞতার সাথে মিলে যাচ্ছে কাশ্মীরের বুকে গণতন্ত্র হত্যার ছবিটি। তাই কাশ্মীরের মানুষের সমস্যা কেবল তাদেরই সমস্যা নয়, সারা দেশের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষেরই সমস্যা। এনারসি, সিএএ, এনপিআর বিরোধী লড়াইতে যেমন সারা দেশ জেগেছে তেমন করেই ভারতের সকল খেটে খাওয়া মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লড়াইয়ের অঙ্গীকার করতে হবে কাশ্মীরের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের লড়াইকে।

সূত্র ঃ The Statesman, 10.04.2020
Al Jazeera News, 1.04.2020, Srinagar.
Peerzada Ashique 04.04.2020
The Hindu, 1 April, 2020, Srinagar
The Wire, 1 April & 27 April, 2020

ডাক্তারি ছাত্রদের কোভিড ওয়ার্ডে ডিউটি করানোর সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা এআইডিএসও-র

নবান্নে ১৭ জুন চিকিৎসক সংগঠনগুলির সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী এমবিবিএস ছাত্রদের কোভিড ওয়ার্ডে ডিউটি করানোর প্রস্তাব এনেছিলেন। সংগঠনগুলির প্রতিবাদে সে সিদ্ধান্ত তিনি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। অথচ ঠিক তার পরেই সাংবাদিকদের সামনে তিনি ওই প্রস্তাবটিকে সিদ্ধান্ত হিসাবে ঘোষণা করেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই অগণতান্ত্রিক আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানায় এআইডিএসও। ওইদিনই এক বিবৃতিতে রাজ্য সম্পাদক মণিশংকর পট্টনায়ক বলেন,

লকডাউনের ফলে মেডিকেলের সমস্ত কোর্সগুলিতে পঠনপাঠন বন্ধ। ক্লিনিক ও প্র্যাকটিকাল নির্ভর এই কোর্সের ছাত্রছাত্রীরা উপযুক্ত ট্রেনিং না পেলে তার ফল কত মারাত্মক হতে পারে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সংগঠনের পক্ষ থেকে বার বার দাবি করা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকার তাদের পড়াশুনার ব্যাপারে উদাসীন। অথচ আজ এভাবে তাদের কোভিড ওয়ার্ডে ডিউটি দেবার সিদ্ধান্তে বোঝা গেল, কেন্দ্রীয় সরকারের মতোই রাজ্য সরকারেরও বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলার মতো কোনও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নেই, বরং সারবত্তাহীন কিছু পদক্ষেপ নিয়ে তাঁরা আসল সমস্যা চাপা দিতে চাইছেন।

করোনা সংক্রমণ যেভাবে বাড়ছে, তাতে হাসপাতালে বেড বাড়ানোর পাশাপাশি উপযুক্ত আইসিইউ ট্রেনিংপ্রাপ্ত প্রচুর চিকিৎসক নিয়োগ করা দরকার। কিন্তু সেই প্রয়োজন কখনই অনভিজ্ঞ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে পূরণ হতে পারে না। তিনি বলেন, এই অবৈজ্ঞানিক ও হঠকারী পদক্ষেপ একদিকে রোগীদের প্রকৃত চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দেবে। পাশাপাশি, ডাক্তারি ছাত্রদের উপযুক্ত ট্রেনিং ও সুরক্ষা ছাড়া কাজ করতে বাধ্য করার মধ্য দিয়ে তাদেরও সংক্রমণের মুখে ঠেলে দেওয়া হবে। অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে ডিএসও। পাশাপাশি রোগ সংক্রমণ মোকাবিলায় বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসকদের উপযুক্ত ট্রেনিং দিয়ে কোভিড ওয়ার্ডে চিকিৎসার উপযুক্ত করা এবং সমস্ত সক্ষম রেজিস্টার্ড প্র্যাকটিশনার্সকে ব্যাপক ভাবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় নিয়োগ করে রাজ্যব্যাপী বিরাট নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার দাবিও জানায় তারা।

কোচবিহারে বিনা পয়সার বাজার

এআইডিএসও তুফানগঞ্জ মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে ১০ জুন সুব্রত চৌধুরী স্মৃতি পাঠাগারে 'বিনা পয়সার বাজার'-এ ৬০টি দুঃস্থ পরিবারের হাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী (চাল, ডাল, তেল, নুন, বিস্কুট, চিনি ও শাক-সবজি) তুলে দেওয়া হয়। বিনা পয়সার বাজারের উদ্বোধন করেন গণআন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ও প্রাক্তন সাংসদ কমরেড দেবেন্দ্র নাথ বর্মন। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অর্জুন বর্মন।

গরিব কল্যাণ প্রকল্পে সব পরিযায়ী শ্রমিককে যুক্ত করতে হবে

প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি এ আই ইউ টি ইউ সি-র

পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকদের গরিব কল্যাণ রোজগার প্রকল্পে অর্ন্তভুক্ত করার দাবিতে এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস ১৯ জুন প্রধানমন্ত্রীকে নিম্নলিখিত চিঠিটি দেন।

সংবাদে প্রকাশ কেন্দ্রীয় সরকার গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযান নামে এক প্রকল্পের মাধ্যমে মূলত পরিযায়ী শ্রমিকদের নিজ বাসস্থান অঞ্চলে কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা করার কথা ঘোষণা করেছে। কাজ দেওয়া হবে ১২৫ দিন। এই প্রকল্পে বরাদ্দ করা হয়েছে ৫০ হাজার কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই টাকা আসবে কেন্দ্রের ১২টি মন্ত্রকের ২৫টি প্রকল্প থেকে। এই প্রকল্পগুলিতে বাজেটে বরাদ্দ করা অর্থ থেকেই এই কাজ হবে। ফলে নতুন করে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হলেও নতুনভাবে কোনও টাকা বরাদ্দ করা হয়নি। এই টাকায় কাজ পাবে খুব বেশি হলে প্রায় ৭০ লক্ষ শ্রমিক। এই প্রকল্প চালু হবে মাত্র ৬টি রাজ্যের (বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খন্ড, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ) ১১৬ জেলায়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী দেশে ৮ কোটি পরিযায়ী শ্রমিক আছেন। বাস্তবে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ১৫ কোটিরও বেশি। পশ্চিমবঙ্গেও পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে হঠাৎ করে লকডাউন ঘোষণা করার ফলে সবচেয়ে বেশি অবর্ণনীয় দুঃখ-যন্ত্রণা-লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। অনেকেই বাড়ি ফেরার পথে অনাহারে, মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।

এই পরিস্থিতিতে আমরা দাবি করছি— দেশের সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিককে এই প্রকল্পের আওতায় আনতে হবে, কোনও অজুহাতেই পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকদের এই প্রকল্পের আওতার বাইরে রাখা চলবে না, রাজ্যের সমস্ত জেলাকে এই প্রকল্পের অর্ন্তভুক্ত করতে হবে, এই প্রকল্পকে আপাতত কমপক্ষে এক বছর চালু রাখতে হবে, প্রয়োজনে তা আরও বাড়াতে হবে এবং এই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।'

সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতি দাবি

বিক্ষোভে ফ্রান্সের স্বাস্থ্যকর্মীরা

দুনিয়ার আর পাঁচটা পুঁজিবাদী দেশের মতো ফ্রান্সেও সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা চূড়ান্ত অবহেলার শিকার। সেখানে একের পর এক ক্ষমতাসীন সরকার স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ ক্রমাগত কমিয়ে চলেছে। এদিকে করোনা অতিমারি গোটা দুনিয়া জুড়েই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা ছাড়া মানুষের গত্যন্তর নেই। ফ্রান্সও তার ব্যতিক্রম নয়।

এই অবস্থায় সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা রক্ষার দাবিতে পথে নামলেন ফ্রান্সের স্বাস্থ্যকর্মীরা। গত ১৬ জুন চিকিৎসক-নার্স সহ সে দেশের লক্ষ লক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী গোটা দেশ জুড়ে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান। স্বাস্থ্যকর্মীদের দুটি সংগঠনের উদ্যোগে সংগঠিত এই বিক্ষোভ কর্মসূচিকে সমর্থন জানিয়েছে ফ্রান্সের শ্রমিক সংগঠনগুলি, যাদের মধ্যে রয়েছে সেখানকার সর্ববৃহৎ শ্রমিক সংগঠন জেনারেল কনফেডারেশন অফ লেবার (সিজিটি)-ও।

এদিন শুধু রাজধানী প্যারিসেই পথে নামেন লক্ষাধিক স্বাস্থ্যকর্মী। মার্সেইল, তুলুস ইত্যাদি শহরগুলিতেও হাজার হাজার স্বাস্থ্যকর্মী বিক্ষোভ দেখান। সরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পরিকল্পিত অবহেলা ও ব্যয়বরাদ্দ কমানোর জন্য ইমানুয়েল ম্যাকরঁ সরকারের নিন্দায় সরব হন বিক্ষোভকারীরা।

উদ্যোক্তা সংগঠনের এক মুখপাত্র বলেছেন, সরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা ও চিকিৎসা-উপকরণের অভাবে রোগীদের ঠিকমতো পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সমস্যার কথা জানিয়ে গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সরকারের কাছে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছেন তাঁরা। অথচ হেলদোল নেই সরকারের।

বছরখানেক ধরেই স্বাস্থ্যকর্মীদের বিক্ষোভ চলছে ফ্রান্সে। গত বছর প্রায় আড়াইশোটি সরকারি হাসপাতালের দুর্ঘটনা ও জরুরি বিভাগের কর্মীরা ধর্মঘট করেছিলেন। কর্মীসংখ্যা, হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা ও চিকিৎসার অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর দাবি ছাড়াও বেতনবৃদ্ধির দাবিও জানিয়েছিলেন তাঁরা। দীর্ঘ আন্দোলনের চাপে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট গত মার্চ মাসে বেশ কয়েকটি দাবি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে ধর্মঘট ওঠে। কিন্তু আজও সেইসব প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি ম্যাকরঁ সরকার। তাঁকে সে কথা মনে করিয়ে দিতে এবং দেশের মানুষের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়নের দাবিতে তাই আবার পথে নেমেছেন ফ্রান্সের স্বাস্থ্যকর্মীরা। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি তাঁদের এই আন্দোলনে সংহতি জানিয়েছেন সেখানকার বামপন্থী সংগঠনগুলিও। তাঁদের অনেকেই এ দিন বিক্ষোভকারীদের পায়ে পা মিলিয়েছেন।

(সূত্র ঃ পিপলস ডিসপ্যাচ, ১৭ জুন, '২০ সংখ্যা)

পাঠকের মতামত

অন্য রকম এক ছবি

ভিন রাজ্য থেকে আসা সেই রাজ্যের শ্রমিকদের আখ্যায়িত করা হয়েছে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে। পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া লক ডাউন ঘোষণার পর এই শ্রমিকরা পড়েছেন আতান্তরে। দূর দূরান্ত থেকে ঘরে ফেরার সমস্ত রাস্তাই বন্ধ। তা সত্ত্বেও হাঁটা পথে, সাইকেলে, মালবাহী লরিতে মালপত্রের মধ্যে, সাধ্যাতীত অর্থ ব্যয় করে গাড়ি বা বাসে, অনেক পরে ট্রেনে, অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের মধ্যে এঁদের ঘরমুখী মিছিল প্রত্যক্ষ করেছে সমগ্র বিশ্ববাসী। সরকারের অপরিণামদর্শিতা ইতিমধ্যে কেড়ে নিয়েছে বহু শ্রমিকের প্রাণ। তাদের জীবন-জীবিকাকে ঠেলে দিয়েছে এক অন্ধকার ভবিষ্যতের পানে।

ঘরে এসেও রেহাই নেই। ঘর, নিজের এলাকা, নিজের গ্রাম এঁদের আপন করে নিচ্ছে না। এ কেবল করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে দৈহিক দুরত্ব রক্ষার কারণে নয়, এর পেছনে রয়েছে নানা অজ্ঞতা, অন্ধতা, দীর্ঘ দিন ধরে লালিত নানা কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তা-চেতনা। তাই দৈহিক দূরত্বের সাথে রচিত হয়েছে সামাজিক দুরত্বও। রোগ নিয়ে সতর্কতা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলে রোগীকে একঘরে করা— এ তো মেনে নেওয়া যায় না। এ তো পিছিয়ে পড়া চিন্তা-ভাবনার পরিণাম।

সম্প্রতি এ রাজ্যের ঝাড়গ্রাম জেলার জঙ্গলমহলের দুটি গ্রাম আমাদের কাছে সে শিক্ষাই তুলে ধরল। এখানে ভিন রাজ্য থেকে ফিরে আসা নিভৃতবাসে থাকা শ্রমিকদের এলাকার মানুষ যত্ন নিয়েছেন। এলাকার মানুষ তাঁদের সুযোগ-সুবিধা-স্বাচ্ছন্দের দিকে খেয়াল রেখেছেন, আপনজন হিসাবে উষ্ণ সম্পর্কের কোনও ঘাটতি রাখেননি।

ঝাড়গ্রাম ব্লকের মানিকপাড়া পঞ্চায়েতের লোধা-শবর অধ্যুষিত পূর্বশোল খাতায়-কলমে পিছিয়ে পড়া একটি গ্রাম। গত নভেম্বরে ঝাড়খণ্ডের ইটভাটায় শ্রমিকের কাজে গিয়েছিলেন গ্রামের শবর ও কুড়মি সম্প্রদায়ের ৮ জন। এক শবর দম্পতি তাঁদের সাত বছরের ছেলেকেও নিয়ে গিয়েছিলেন। ২২ মে প্রথমে গাড়িতে, তার পর দীর্ঘ পথ হেঁটে মানিকপাড়ায় পৌঁছান ওই পরিযায়ী শ্রমিকরা। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরীক্ষা করিয়ে গ্রামে ফেরেন। স্থানীয় ক্লাব, স্ব-সহায়ক দলের সদস্য ও গ্রামবাসীরা মিলে বৈঠক করে স্ব-সহায়ক দলের কর্মশালা ভবনেই ৮ জনের থাকার ব্যবস্থা করে দেন। এখন সবাই যে যার ঘরে ফিরে গেছেন। স্ব-সহায়ক দলের নেত্রী তমসী মাহাতো জানালেন, ১৪ দিনের নিভৃতবাস শেষে গ্রামবাসীদের উদ্যোগে মাংস-ভাত-মিষ্টি খাইয়ে বাড়ি পাঠানো হয়েছে পরিযায়ীদের। শবর দম্পতি মনোরঞ্জন ও রিঙ্কু ভুক্তা বলেছেন, 'ফেরার আগে ভয় ছিল, গ্রামে ঢুকতে পারব কিনা। এমন আতিথেয়তা পাব সত্যি ভাবিনি।' (সংবাদ সূত্রঃ পরিযায়ী পর নন, শেখাচ্ছে বাংলার পিছিয়ে পড়া গ্রাম, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭/০৬/২০২০)।

ওই জেলারই বিনপুরের দহিজুড়িতে আবার নিভৃতবাসে সম্প্রীতির বন্ধন দেখা গেল। তামিলনাড়ু ফেরত ৭ পরিযায়ীর মধ্যে ১ জন ছিলেন হিন্দু, বাকিরা সবাই মুসলিম। শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের ভবনে একসঙ্গে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করেন স্থানীয়রাই। পরিযায়ী শ্রমিক বিজয় মহন্তের খাবার এসেছিল নিভৃতবাসে থাকা মেহবুব আলি, আসগর আলি, সাদ্দাম খাঁ, শেখ রসিদ বক্সদের বাড়ি থেকে। সাদ্দাম, বিজয়েরাও নিভৃতবাস থেকে বাড়ি ফিরেছেন। (সংবাদ সূত্রঃ ওই)।

মানুষে মানুষে সম্পর্কের বাঁধন যখন ধীরে ধীরে আলগা হচ্ছে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভেদের প্রাচীরকে রাষ্ট্রের মদতে যখন দেশজুড়ে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতায় বাড়িয়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত, এ নিয়ে অসহিষ্ণুতা যখন মানবিক মূল্যবোধকে নির্মমভাবে নিষ্পেষণ করছে, তখন এই অতিমারির সময়েও এর বিপরীত চিত্র আমাদের ভিন্ন ভাবনায় ভাবিত করে, নতুন আশায় উজ্জীবিত হতে শক্তি যোগায়। মনে হয়, মতলববাজদের লক্ষ্য পূরণের পথে বাধার শক্তিও রয়েছে এই সমাজ অভ্যন্তরে, যাকে পুষ্ট করার দায়িত্ব যে কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, সমাজ সচেতন মানুষের।

গৌরীশংকর দাস
খড়্গপুর

বিজেপিকে আড়াল করতেই দিল্লি দাঙ্গার তথাকথিত অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট

এ বছর ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে উত্তর-পূর্ব দিল্লির জাফরাবাদে দাঙ্গার নামে যে পরিকল্পিত গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল এবং যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হতে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীন দিল্লি পুলিশ দাঁড়িয়ে থেকে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালনের (এমনকি কোনও কোনও ক্ষেত্রে দাঙ্গায় সক্রিয় মদত) জন্য দিল্লি হাইকোর্টের ভর্ৎসনা শুনেছিল, সেই ভয়াবহ ঘটনার একটি রিপোর্ট তথ্য অনুসন্ধান কমিটি সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছে জমা দিয়েছে এবং এর অংশবিশেষ সংবাদমাধ্যমেও দেওয়া হয়েছে। এই কমিটিতে হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, তিন জন আমলা, এনআইএ-র প্রাক্তন সরকারি উকিল সহ ছ'জন ছিলেন। 'কল ফর জাস্টিস' নামে এক এনজিও-র দ্বারা গঠিত হলেও বাস্তবে এই কমিটি ছিল সরকারের অদৃশ্য হাতে-গড়া এক কমিটি। কমিটির সদস্যরা ২৯ ফেব্রুয়ারি এবং ১ মার্চ দাঙ্গা কবলিত এলাকা ঘুরে দেখেন। তারা জানান 'হিন্দু এলাকাগুলিতে দোকান ও বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশি এবং হিন্দু মানুষরা সাক্ষ্যপ্রমাণ তাদের দেখাতে পারলেও, মুসলিম মানুষরা তেমন কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ দেখাতে পারেননি। তারা আরও জানান এই ঘটনার পিছনে সিএএ বিরোধী আন্দোলনের মদতদাতা 'টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং', বিভিন্ন মৌলবাদী সংগঠন এবং পাকিস্তান ও আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনগুলির হাত রয়েছে। (টাইমস নাও নিউজ.কম, মে ২৯,২০২০)। কমিটির এই অনুসন্ধান সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় কেন্দ্রীয় সরকারের জঘন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভূমিকাকে আড়াল করতেই এই কমিটি গড়া হয়েছিল। না হলে মাত্র দু'দিন ঘুরে বিস্তীর্ণ এলাকার ভীত সন্ত্রস্ত মানুষের কাছে তারা পৌঁছতে পারলেন কী করে? যে মানুষগুলি এলাকাছাড়া হয়ে গিয়েছে তাঁদের কাছে পৌঁছানোর কোনও তাগিদ তাঁদের ছিল না। যেখানে ঘটনার সমসাময়িক দিনগুলিতে সংবাদপত্র, মিডিয়া, ম্যাগাজিনগুলিতে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলির বাড়িঘর, দোকানপাট, মসজিদের ভাঙচুরের ছবি ও তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল, কমিটির সদস্যদের নজরে তা পড়ল না কেন? সরকারের ঘোষিত ৫৩ জন মৃতের মধ্যে মুসলিমের সংখ্যা ৩৮। ঘরছাড়াদের অধিকাংশই মুসলিম। তা হলে এটা কি 'জাস্টিস'? নিরপেক্ষ সত্য উদঘাটন? আবার আরএসএস ও হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির ভূমিকার ব্যাপারে কমিটি সম্পূর্ণ নীরব থাকল।

আসলে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের হীন সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটি বুঝলে এই সংগঠিত পরিকল্পিত দাঙ্গার চরিত্রটি বুঝতে কারও অসুবিধা হয় না। কি ছিল সেই সময়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট? মুসলিম বিদ্বেষ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের আপামর সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভাজনের উগ্র সাম্প্রদায়িকতাকে মদত দিতে কেন্দ্রীয় সরকার এনেছিল নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, ২০১৯। এর বিরুদ্ধে দেশের প্রান্তে প্রান্তে গড়ে উঠেছিল ধারাবাহিক আন্দোলন। দিল্লির শাহিনবাগে তিন মাস ধরে মহিলাদের অবস্থান এই আন্দোলনগুলিতে প্রেরণা জোগাচ্ছিল। পাশাপাশি দিল্লির দুই বিশ্ববিদ্যালয় জেএনইউ এবং জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার মুক্তচিন্তার বাহক ছাত্রছাত্রীদের সাহসী প্রতিবাদ কর্মসূচিও দেশের সচেতন চিন্তাশীল নাগরিকদের সমর্থন পাচ্ছিল। আবার এই দুই আন্দোলনকে ভাঙার জন্য সরকারের হুমকিও কম ছিল না। এই আবহেই দিল্লির পূর্বপ্রান্তে জাফরাবাদেও গড়ে ওঠে সিএএ বিরোধী এক অবস্থান। এই অবস্থান শুরু হতেই বিজেপির উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেতা কপিল মিশ্র উস্কানিমূলক ভাষণে দিল্লি পুলিশকে হুমকি দিয়ে বলেন যে, অবিলম্বে আন্দোলনকারীদের হঠিয়ে না দিলে, তারা নিজেরাই এই কাজ করবে। এরপরই এই হত্যাকাণ্ড ও দাঙ্গার ঘটনা ঘটল। অথচ এই সম্পর্কে কমিটির কোনও পর্যালোচনা ছিল না। ফলে এটা পরিষ্কার বিজেপি সরকারের ইঙ্গিতেই তৈরি এই কমিটির রিপোর্ট আসলে দিল্লির এই ঘটনার পিছনে বিজেপি দলের ঘৃণ্য হীন কাজকে ঢাকতেই মরিয়া প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়।

তেমনি বিজেপি সরকারের আরও ঘৃণ্য কাজ হল করোনা ও লকডাউনের এই পরিস্থিতিতে যখন মানুষের রাস্তায় নেমে আন্দোলন করার সুযোগ নেই, তখন তারা সিএএ বিরোধী আন্দোলনকারীদের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ইউএপিএ আইনে গ্রেপ্তার করে প্রতিহিংসা চালাচ্ছে। কিন্তু প্রতিহিংসা চালিয়ে হোক, বা সত্যকে চাপা দেওয়ার প্রয়াসই হোক, ইতিহাসে কোনও শাসকই এইভাবে চিরকাল তার শাসন শোষণের যন্ত্র বহাল রাখতে পারেনি। বিজেপিও পারবে না।

নদীয়া জেলা জুড়ে যুব বিক্ষোভ

এআইডিওয়াইও রাজ্য কমিটির ডাকে ১০-১৭ জুন দাবি সপ্তাহে, পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজ না পাওয়া পর্যন্ত ৮০০০ টাকা ভাতার দাবিতে, লকডাউনে কর্মচ্যুত কোটি কোটি শ্রমিকের পুনর্বহাল, সমস্ত সরকারি শূন্যপদে অবিলম্বে নিয়োগ, কাজের অধিকারকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া এবং আমপান ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর সদর মহকুমা সহ পলাশীপাড়া, নাকাশিপাড়া, কালিগঞ্জ, রানাঘাট, করিমপুর, চাপড়া প্রভৃতি ব্লকে বিক্ষোভ ও বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ, পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজ ও খাদ্যের দাবিতে তমলুকে বিক্ষোভ

করোনা বিপর্যয়ের মধ্যে আমপানে ব্যাপক ক্ষতির দরুন লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ দিশেহারা। ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ নিয়ে বিস্তর দলবাজি দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের ১০০ দিনের কাজ ও খাদ্যের দাবিতে এবং সকলকে জবকার্ড দেওয়ার দাবিতে দলের উদ্যোগে ১৮ জুন তমলুক ব্লক অফিসে বিক্ষোভ দেখান শতাধিক মানুষ।

বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন তমলুক লোকাল কমিটির সদস্য শম্ভু মান্না, শিক্ষক সৌমিত্র পট্টনায়েক, যুবকর্মী সঞ্জয় জানা, তরুণ ঘোড়াই, প্রতিমা জানা প্রমুখ।

প্রতিবাদ দিবস পালনের ডাক জেপিএ-র

বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী ও কর্মচারীবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ অ্যাকশন (জেপিএ) ৩ জুলাই প্রতিবাদ দিবস পালনের ডাক দিয়েছে।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কর্পোরেট স্বার্থবাহী জনবিরোধী নীতির কারণে এমনিতেই দেশের শ্রমিক-কর্মচারীদের দুর্দশা ক্রমাগত বাড়ছিল। তার উপর সাম্প্রতিক লকডাউনের সুযোগ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সরকারি সংস্থাগুলির ব্যাপক হারে বেসরকারিকরণ, ৪৮ লক্ষ কর্মচারী এবং ৬৮ লক্ষ পেনশনভোগীর মহার্ঘ ভাতা স্থগিত করে দিয়েছে। কয়েকটি রাজ্য সরকার লকডাউনের কারণে সংগঠিত প্রতিবাদ না হতে পারার সুযোগে ১২ ঘন্টার শ্রমদিবস চালু করে দিয়েছে। সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থারও বেহাল দশা। এই পরিস্থিতিতে জেপিএ-র পক্ষ থেকে ২২ মে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে। চিঠিতে দাবি তোলা হয়েছে, সরকারি সংস্থার বেসরকারিকরণ, ডাউনসাইজিং করা চলবে না, চুক্তিতে কর্মচারী নিয়োগ বন্ধ করতে হবে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলিকে সরকারি ক্ষেত্রের ১ কোটি শূন্য পদ পূরণ করতে হবে ইত্যাদি।

মথুরাপুর-রায়দিঘি রোড মেরামতের দাবিতে অবরোধ

বর্ষাতে দক্ষিণ ২৪ পরগণার মথুরাপুর-রায়দিঘি রোডের অবস্থা খুব খারাপ। প্রতিদিন দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। পায়ে চলাচলেরও অযোগ্য হয়ে পড়েছে রাস্তা। রোগী ও অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা বিঘ্নিত হচ্ছে। অবিলম্বে রাস্তা মেরামতির দাবিতে ২০ জুন সকালে কাটানদিঘি মোড়ে দলের উদ্যোগে অবরোধ করা হয়। শতাধিক মানুষ অবরোধে সামিল হন। সাধারণ মানুষ ও নিত্যযাত্রীরা গাড়ি থেকে নেমে আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানান এবং সামিল হন। অবরোধে লালপুর-নালুয়া-কৃষ্ণচন্দ্রপুর আঞ্চলিক সম্পাদক ও প্রাক্তন শিক্ষক লক্ষণ মণ্ডল সমস্যা ও আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা জনসমক্ষে তুলে ধরেন এবং আগামী সপ্তাহে পিডব্লিউডি, বিডিওতে ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ কর্মসূচিকে সফল করার আবেদন জানান।

শিক্ষা অধিকর্তাদের কাছে দাবিপত্র পেশ ত্রিপুরায়

পরীক্ষার ফলপ্রকাশ, বিনামূল্যে বই দেওয়া, লকডাউনের সময়ে সমস্ত রকম ফি মকুব, সমস্ত স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি দাবিতে ১৫ জুন এ আই ডি এস ও-র পক্ষ থেকে স্কুল শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড মৃদুলকান্তি সরকার ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড রামপ্রসাদ আচার্য এতে নেতৃত্ব দেন।

১৭ জুন সংগঠনের ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির পক্ষ থেকে উচ্চশিক্ষা অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। অতিমারি পরিস্থিতিতে উচ্চশিক্ষায় সমস্ত ধরনের ফি মকুব, অবিলম্বে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম সেমেস্টারের মার্কশিট দেওয়া, অনলাইন ক্লাসের উপর ভিত্তি করে নয়, সিলেবাসের ঘাটতি পূরণ করেই চূড়ান্ত সেমেস্টারের পরীক্ষা নেওয়া এবং প্রতিটি কলেজে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অধ্যাপক নিয়োগ করা প্রভৃতি দাবিতে রাজ্য সভাপতির নেতৃত্বে স্মারকলিপি দেয় ছাত্ররা। শিক্ষা অধিকর্তা দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

বিষ্ণুপুর বিএমওএইচ ডেপুটেশন আশা কর্মীদের

আশা কর্মীদের ওপর প্রকল্প বহির্ভূত কাজ চাপিয়ে দেওয়া, করোনা পরিস্থিতিতে এলাকার কাজ বন্ধ রেখে অন্য ব্লকে কাজ করতে পাঠানো, আমপান ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সার্ভে করা, এলাকায় বিভিন্ন সরকারি কাজে নজরদারি ইত্যাদি কাজ করতে বাধ্য করার প্রতিবাদে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের বিষ্ণুপুর-২ ব্লক কমিটির উদ্যোগে বিপুল সংখ্যক আশা কর্মী ১৫ জুন সামালী ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিএমওএইচকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান এবং বিএমওএইচ-এর নিকট ডেপুটেশন দেন। এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের বিষ্ণুপুর ব্লকের সম্পাদিকা তাপসী মণ্ডল। বিএমওএইচ স্মারকলিপি গ্রহণ করেন এবং বিক্ষোভকারীদের সামনে এসে প্রতিশ্রুতি দেন— তিনি দ্রুত স্মারকলিপিটি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবেন এবং আশাকর্মীদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন।

কলকাতায় সিইএসসি দপ্তরে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভ

প্রতি মাসে ২০০ ইউনিট করে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, আমপানে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন এলাকায় দ্রুত আইনানুগ পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ সংযোগ, সিইএসসি কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে মৃত কর্মীদের প্রতি পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমারস অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা)। ৩ জুন অ্যাবেকার সদস্যরা সি ই এস সি-র ভিক্টোরিয়া হাউসে বিক্ষোভ দেখাতে গেলে সিকিউরিটি কর্মীরা তাদের বাধা দেন। ধস্তাধস্তি বেধে যায় গ্রাহকদের সঙ্গে। অবশেষে সি ই এস সি কর্তৃপক্ষ স্মারকলিপি নিয়ে দাবিগুলি বিবেচনার আশ্বাস দেন।

আসামের হাইলাকান্দিতে ত্রাণ বিতরণ

১৬ জুন এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর উদ্যোগে আসামের হাইলাকান্দি জেলার মোহনপুর গ্রামের ভট্টের বাজার অঞ্চলে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে দুঃস্থ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, তেল, সাবান ইত্যাদি সামগ্রী বন্টন করা হয়।
সম্প্রতি করোনা মহামারী এবং ইতিমধ্যে ঘটে যাওয়া ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে কিছুটা স্বস্তি দিতে এই কার্যসূচি গ্রহণ করে দলের হাইলাকান্দি জেলা কমিটি।

১২ জুন কোচবিহারের মাথাভাঙা-২ ব্লকের ছেড়ামারী গ্রামের একটি কোয়ারান্টিন সেন্টারে পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ালেন এস ইউ সি আই (সি) কর্মীরা। দলের যুব কর্মীরাও এতে সামিল হন।

পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ গুজরাটে

আন্তর্জাতিক বাজারে দাম যখন তলানিতে তখন দেশীয় বাজারে পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়িয়েই চলেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এর প্রতিবাদে সারা দেশেই এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে আন্দোলন চলছে। ১৬ জুন দলের গুজরাট রাজ্য সংগঠনী কমিটির ডাকে পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে অনলাইন প্রতিবাদ করা হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু সাধারণ মানুষ এই প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করেন।

আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটায় ৪১টি দুঃস্থ চর্মশিল্পী পরিবারের সদস্যরা দলের নেতৃত্বে বিডিও দপ্তর থেকে ত্রাণের দাবি আদায় করেন। ১৯ জুন তাঁদের হাতে চালের কুপন, মাস্ক ইত্যাদি তুলে দেওয়া হয়

পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ

পেট্রল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ও অবিলম্বে তেলের দাম কমানোর দাবিতে ১৭ জুন পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদাতে প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল এস ইউ সি আই (সি)। এ দিন বেলদা কেশিয়াড়ি মোড়ে বিক্ষোভ দেখান দলের কর্মী-সমর্থকেরা। পথসভাও হয়।

বর্ধমান শহরে বিক্ষোভ। ১৯ জুন

এ আই এম এস এসের পক্ষ থেকে দার্জিলিং-এ মেডিক্যাল সুশ্রুত নগর এলাকায় ত্রাণ বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা শিখা নন্দী।

১৭ জুন কলকাতার শ্যামপুকুর-কাশীপুর আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে ঘোষবাগানে বেশ কিছু দুঃস্থ পরিবারের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়

কর্ণাটকে ভূমি সংস্কার আইন পাল্টাতে চলেছে বিজেপি সরকার

রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ এস ইউ সি আই (সি)-র

লকডাউনের সুযোগ নিয়ে কর্ণাটকে ভূমি সংস্কার আইন-১৯৬১-র পরিবর্তন আনতে চলেছে রাজ্যের বিজেপি সরকার। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, নতুন আইনে অ-কৃষিজীবীদের কৃষিজমি কেনার অধিকার দেওয়া এবং কৃষিজমি কেনার জন্য অ-কৃষি ক্ষেত্র থেকে উপার্জিত আয়ের ঊর্ধ্বসীমা তুলে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির পরিমাণ বৃদ্ধির কথাও এই আইনে বলা হয়েছে। রাজ্য মন্ত্রীসভার এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলা হয়েছে, রাজ্য বিধানসভার আগামী অধিবেশনে এই আইন সংশোধন করা হবে, যার ফলে যে কেউ ইচ্ছামতো কৃষিজমি কিনতে পারবে। এছাড়াও সম্প্রতি কর্ণাটকের বিজেপি রাজ্য সরকার কৃষিপণ্য বিক্রয় কমিটি আইনেও পরিবর্তন এনেছে।

বুঝতে অসুবিধা হয় না, সরকারের এই পদক্ষেপগুলি কৃষিজমি ও কৃষিপণ্য বিক্রির ওপরে চাষির অধিকার খর্ব করে বৃহৎ ব্যবসায়ী ও কর্পোরেটদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করবে। সরকারের কৃষকবিরোধী এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। দাবি ওঠে, অবিলম্বে এই কৃষক-বিরোধী পদক্ষেপ প্রত্যাহার করতে হবে।

অনলাইন শিক্ষা বৈষম্য বাড়াচ্ছে

প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবিপত্র পেশ করল এ আই ডি এস ও

দেশ জুড়ে করোনা অতিমারিকে অজুহাত করে ও সংগঠিত আন্দোলন গড়ে না ওঠার এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত সুকৌশলে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষা ও ছাত্রস্বার্থ বিরোধী নীতিগুলি চালু করতে উদ্যোগ নিয়েছে। এর বিরুদ্ধে আট দফা দাবিতে ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র ডাকে সারা দেশে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান চলে। ২২ জুন এই গণস্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র পেশ করা হয় প্রধানমন্ত্রী ও মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীকে। দেশের সমস্ত নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের এবং স্কুলের কয়েক হাজার ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক, অধ্যাপক ও অভিভাবকরা এই দাবিপত্রে সই করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই ব্যাপক আক্রমণের বিরুদ্ধে লকডাউনের পরিস্থিতির মধ্যেই সর্বস্তরের মানুষ আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন।

পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজে পুনর্বহাল, মাসিক ৮০০০ টাকা ভাতা ও বেকারদের কাজের দাবিতে অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও-র পক্ষ থেকে পূর্ব বর্ধমান জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এছাড়াও জেলার কালনা ও কাটোয়া মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির আহ্বানে ৭ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগণার ডায়মণ্ডহারবারে পরিচারিকারা বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি ছিল — বর্তমান পরিস্থিতিতে মাসিক ৬০০০ টাকা সরকারি অনুদান কমপক্ষে ৬ মাস পর্যন্ত দিতে হবে, পরিচারিকা সন্তানদের বিনামূল্যে শিক্ষা সামগ্রী দিতে হবে, মদ ও মাদক দ্রব্য বিক্রয় কঠোর হাতে দমন করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে চিঠি পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের

কোভিড-১৯ অতিমারির ভয়াবহ পরিস্থিতিতে রাজ্যের ১২৬টি পুরসভার পৌর স্বাস্থ্যকর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে চলেছেন। করোনা রোগ মোকাবিলার সাথে সাথে ডেঙ্গু, টিভি, ডায়রিয়া, কুষ্ঠ ইত্যাদির রোগের বিরুদ্ধেও অভিযান চালাচ্ছেন তাঁরা। কাজের পরিসর ক্রমাগত বাড়ছে তাঁদের। অথচ তাঁদের মাসিক বেতন গত দশ বছর ধরে মাত্র ৩১২৫ টাকায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, যা দিয়ে পরিবার প্রতিপালন করা বাস্তবে অসম্ভব। এই পরিস্থিতিতে গত ১৮ জুন মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন সভানেত্রী সুচেতা কুণ্ডু এবং যুগ্ম সম্পাদক পৌলমী করঞ্জাই ও কেকা পাল। চিঠিতে অবিলম্বে বেতন বৃদ্ধি, পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের স্থায়ী সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি, আইনানুযায়ী পিএফ, গ্র্যাচুইটি, ইএসআই, পেনশন সহ সমস্ত সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়ার পাশাপাশি করোনা মোকাবিলার জন্য তাঁদের জন্য যে ভাতার প্রতিশ্রুতি কর্তৃপক্ষ দিয়েছিল, তা পূরণ করার দাবি জানানো হয়।

কোচবিহারে পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের বিক্ষোভ

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

পশ্চিমবঙ্গকে শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে

এস ইউ সি আই (সি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২২ জুন এক বিবৃতিতে বলেন, "এই রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকরা 'পরিযায়ী শ্রমিক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ'-র উদ্যোগে ২২-২৮ জুন যে দাবি-সপ্তাহ পালন করছেন, তার প্রতি আমরা পূর্ণ সংহতি জ্ঞাপন করছি। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় সরকার হঠাৎ লকডাউন ঘোষণার ফলে এই শ্রমিকরা যে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিলেন, হাজার হাজার মাইল হেঁটে ফিরতে গিয়ে অনাহারে, ক্লান্তিতে, দুর্ঘটনায় যাঁদের অনেকের বেদনাদায়ক মৃত্যু ঘটেছে, সেই প্রায় ১৫ কোটি পরিযায়ী শ্রমিকের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার মাত্র ৫০ হাজার কোটি টাকার 'গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযান' নামে একটি প্রকল্প ঘোষণা করেছে। এই প্রকল্প আসলে নতুন নয়, পুরনো ২৫টি প্রকল্পকে জুড়ে এটি তৈরি করা হয়েছে। উপরন্তু এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে দেশের ৬টি রাজ্যের ১১৬টি জেলাকে, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ নেই। এই রাজ্য সহ সকল রাজ্যকে এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা, যতদিন কাজ না পাবেন ততদিন শ্রমিকদের ৭৫০০ টাকা করে মাসিক ভাতা দেওয়া, এই প্রকল্পকে ১২৫ দিনের পরিবর্তে এক বছর চালানো, বিনামূল্যে শ্রমিকদের খাদ্য সরবরাহ করা এবং ন্যূনতম মজুরি ৫০০ টাকা করার যে দাবি তাঁরা উত্থাপন করেছেন, আমরা তা অবিলম্বে কার্যকরী করার দাবি জানাচ্ছি।"

পরিযায়ী শ্রমিক ঃ রাজভবনে বিক্ষোভ

মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের ডাকা ২২-২৮ জুন দাবি সপ্তাহের সমর্থনে ২২ জুন এ আই ইউ টি ইউ সি-র পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাসের নেতৃত্বে রাজভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং রাজ্যপাল দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। দাবি জানানো হয়, কেন্দ্রীয় সরকারের গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযান প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সহ বাদ পড়া সকল রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের যুক্ত করতে হবে, দৈনিক মজুরি কমপক্ষে ৫০০ টাকা দিতে হবে, কাজ না দেওয়া পর্যন্ত ৭৫০০ টাকা মাসিক অনুদানের ব্যবস্থা করতে হবে, অন্তত এক বছরের কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। রাজভবনের গেটে বিক্ষোভ চলে প্রায় ৩০ মিনিট।

কোচবিহারে পরিযায়ী শ্রমিক বিক্ষোভ

ঘরে ফেরা পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজের ব্যবস্থা, জবকার্ড সমস্যার সমাধান, প্রত্যেক পরিযায়ী শ্রমিককে ১০০ দিনের কাজ দেওয়া এবং গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযান প্রকল্পে রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির দাবিতে ২২ জুন তুফানগঞ্জ-১ বিডিওতে 'পরিযায়ী শ্রমিক সমিতি'র দাবিপত্র পেশ

কৃষককে কর্পোরেটের গ্রাসে ঠেলে দিল বিজেপি সরকার

করোনা ত্রাণের আর্থিক প্যাকেজের প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রীর ছেড়ে যাওয়া ব্যাটন হাতে দীর্ঘ দৌড় দেখাতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কারের ব্যবস্থা করেছেন। যার ফলে সারা দেশের কৃষকদের অধিকাংশই এখন থেকে কৃষি পণ্যের কর্পোরেট কোম্পানিগুলির দাদন নিয়ে ঠিকা প্রথায় চাষ করবেন। কেন্দ্রীয় সরকার বলে দিয়েছে এতেই নাকি চাষি স্বাধীন হল, যেখানে বেশি দাম পাবে তারা সেখানেই ফসল বেচবে। কিষান মাণ্ডি কিংবা সরকারি বাজারে আর তাদের যাওয়ারই দরকার নেই। কৃষিপণ্যের নিয়ন্ত্রিত বাজার কমিটিগুলিরও কৃষকের হয়ে ব্যবসায়ীদের সাথে আর কোনও দরাদরির ভূমিকা থাকল না। বহুজাতিক কোম্পানিই কৃষকদের কাছে গিয়ে জানাবে তারা কোন ফসল চায়, কৃষক চুক্তিবদ্ধ হবেন, চাষ করে ফসল তাদের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে ট্যাঁকে টাকা গুঁজতে গুঁজতে বাড়ি চলে যাবেন! এর পরেই কেন্দ্রীয় অর্ডিন্যান্সের জোরে বাতিল হয়েছে অত্যাবশকীয় পণ্য আইন। যার মধ্য দিয়ে অত্যাবশকীয় পণ্য, কৃষিপণ্য যথেচ্ছ মজুত, যত খুশি রপ্তানি ইত্যাদির ছাড়পত্রও পেয়ে গেল বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি। ফসলের ক্রেতা এবং ব্যবসায়ীদের জন্য গুদাম, হিমঘর ইত্যাদির ব্যবস্থা হবে মাণ্ডিতেই। 'অপারেশন গ্রিন' প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার নাবার্ডের মাধ্যমে ৫০০ কোটি টাকা দিচ্ছে। তার সাহায্যে আলু, পেঁয়াজ, টমেটো ইত্যাদি ফসল পরিবহণ এবং হিমঘরে মজুতের খরচে পঞ্চাশ শতাংশ ভরতুকি দেওয়া হবে। মাণ্ডিতে চাষি ফসল নিয়ে গেলে যে ব্যবসায়ীদের তা কিনতেই হবে, তার কোনও বাধ্যবাধকতা আর থাকল না। এই নীতির ফলে সরকারেরও দায় থাকল না ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা এবং তা চাষি যাতে পায় তা দেখার বন্দোবস্ত করার। একই সাথে ধান, গম, পাট, আলু, তৈলবীজ, পেঁয়াজ, সবজি ইত্যাদি সরকার যতটুকু সংগ্রহ করত, তাও আর করবে না। ফসল বিক্রির জন্য পুরোপুরি চাষিকে নির্ভর করতে হবে বেসরকারি পুঁজির দাক্ষিণ্যের উপর। বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের যে ধরনের কারখানা বানাবে তার সাথে সঙ্গতি রেখেই চাষ করতে হবে ফসল। এর পরেও চাষি ভাল দাম পাবে কী করে?

নাবার্ডের টাকায় গড়া পরিকাঠামো ভোগ করবে কারা? চাষিরা, নাকি কৃষিপণ্যের বৃহৎ কারবারি কোম্পানিগুলি? ফসল যখন ওঠে সেই সময় বাজারে ফসলের দাম থাকে সবচেয়ে কম। সেই ফসল ব্যবসায়ীদের গুদামজাত হয়ে গেলে খোলা বাজারে তার দাম ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। চাষির পক্ষে দীর্ঘদিন সেই ফসল ধরে রেখে দাম বাড়ার জন্য অপেক্ষা করা কি সম্ভব? কারণ চাষি চাষ করে ঋণ নিয়ে। সেই ঋণের বেশিরভাগটাই আসে স্থানীয় মহাজনদের কাছ থেকে উচ্চহারের সুদে। ফসল ওঠামাত্রই তা বিক্রি করে দিতে না পারলে তাদের সর্বনাশ। তা হলে ঋণের ফাঁদ আরও চেপে বসবে। অন্যদিকে বহুজাতিক কর্পোরেশন যখন আগাম দাদন দিয়ে চাষ করাবে, তারাও দাম ঠিক করবে ফসল ওঠার সময়কার সম্ভাব্য দামকে ধরেই। তাদের পুঁজির জোর আছে ফলে কম দামে কেনা সেই ফসল তারা মজুত করতে পারবে যত খুশি। গুদাম, হিমঘরের পরিকাঠামো কাজে লাগবে আসলে এই সব বহুজাতিক এবং বৃহৎ ব্যবসায়ীদেরই।

কেন্দ্রীয় সরকার চাষিদের ব্যাঙ্কের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা করবে বলেছিল। পিএম কিষান স্কিমে ১৪.৫ কোটি কৃষককে সাহায্য করার কথা বলেছিল। দেখা যাচ্ছে পিএম কিষানের মাত্র ৬ হাজার টাকা সেটাও পায়নি বেশিরভাগই। দেড় বছরে মাত্র ৯ কোটি কৃষক পরিবারকে সরকার নাকি খুঁজে পেয়েছে। তাদের অর্ধেকের কিছু বেশি বাস্তবে টাকা পেয়েছেন, বাকিদের তাও জোটেনি (দ্য হিন্দু বিজনেস লাইন,২১.০১.২০২০)। অথচ ২০১১-র সেন্সাস এবং ২০১৫-র এগ্রিকালচারাল সেন্সাস দেখাচ্ছে ভারতে জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক কৃষির উপর নির্ভরশীল। দেশের মোট কৃষিঋণের ১৫ শতাংশের বেশি ব্যাঙ্ক থেকে আসে না। সেটাও পায় বৃহৎ জমির মালিকরাই। কারণ কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, বা অন্য পথে ব্যাঙ্কের ঋণ পাওয়ার যা হ্যাপা সামলে ঋণ নেওয়ার ক্ষমতা নেই বেশিরভাগ কৃষকেরই। সমস্ত রাজ্যেই যত নথিভুক্ত কৃষক আছেন তার ৫০ শতাংশের কম ঋণের জন্য আবেদন করতে পারেন। ভূমিহীন চাষি, বর্গাদার, ভাগচাষিদের বেশিরভাগকেই ব্যাঙ্ক ঋণ দেয় না। অথচ তাঁরাই সংখ্যায় বেশি। সরকারি বা ব্যাঙ্কের ঋণ পাওয়ার জন্য যারা বিবেচিত হয়েছেন তাঁরা সরকারি খাতায় জমি মালিক হিসাবে নথিভুক্ত থাকা কৃষকের সংখ্যার তুলনাতেও নগন্য। পশ্চিমবঙ্গে ৭০ লক্ষ নথিভুক্ত কৃষকের মধ্যে ৩৫ লক্ষ, বিহারে ১ কোটি ৬৪ লক্ষের মধ্যে ৫২.৫ লক্ষ, মহারাষ্ট্রের দেড় কোটির মধ্যে ৮৬ লক্ষ, মধ্য প্রদেশের ১ কোটির মধ্যে ৫৫ লক্ষ কৃষক কিছু ঋণ বা সরকারি সাহায্য পাওয়ার জন্য নথিভুক্ত হয়েছেন। আর নথিভুক্ত নন এরকম ভূমিহীন, ভাগচাষির প্রকৃত সংখ্যা সরকার কোনও দিন জানায়নি (দ্য হিন্দু বিজনেস লাইন,২১.০১.২০২০)

বিজেপি সরকারের কৃষক দরদের আর একটি নমুনা হল ব্যাঙ্কের কৃষি ঋণের পরিমাণ। ২০১৭-১৮ সালে ব্যাঙ্কগুলি মোট ঋণ দিয়েছিল ৭৭ লক্ষ কোটি টাকা। তার মধ্যে কৃষি ক্ষেত্রে সব মিলিয়ে দিয়েছিল মাত্র ১০ লক্ষ কোটি টাকা। অথচ মাত্র ১০ জন শিল্পপতি পেয়েছিলেন ৭ লক্ষ কোটি টাকা (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯ জুন ২০২০)। যদিও ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋণের ৮০ শতাংশই হচ্ছে শিল্পপতিদের অবদান। সেখানে কৃষি ক্ষেত্রের অনাদায়ী ঋণ ১০ শতাংশেরও কম (ওই)। অর্থাৎ কৃষককে টাকা দিয়ে বেশিটাই ফেরত পেয়েছে ব্যাঙ্ক। কিন্তু তাদের টাকা না দিয়ে সরকারি ব্যাঙ্কগুলি তাদের কোষাগার খুলে দিয়েছে লুঠেরা শিল্পপতিদের কাছে।

দেশের কৃষকদের বাঁচানোর জন্য যখন দরকার ছিল, সামান্য বা বিনা সুদে সরকারি ঋণ, বিশেষত করোনা মহামারি জনিত পরিস্থিতিতে আরও দরকার ছিল কৃষককে সরাসরি অর্থ সাহায্য। সরকার এর কোনও পথেই গেল না। কৃষককে ফসলের লাভজনক দাম পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে, অন্য দিকে সাধারণ মানুষকে খুচরো বাজারে মূল্যবৃদ্ধির কোপ থেকে বাঁচাতে দরকার ছিল সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য। যার মাধ্যমে বন্ধ হত কৃষিপণ্য নিয়ে একদিকে চাষির আত্মহত্যার মিছিল। কিন্তু বিজেপি সরকার ঠিক উল্টোপথে হেঁটে চাষ থেকে কৃষিপণ্য বিক্রির পুরো ব্যবস্থাটাই তুলে দিল কর্পোরেট পুঁজির হাতে। কৃষকের বাঁচার স্বার্থেই এর মোকাবিলা করা দরকার।